

তোমাকে সবচাইতে লাভ জনক জিনিস কি উহা বলিয়া দিবো? তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, অবশ্যই বলিয়া দিন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, ফরজ নামাযের পর দুই রাকআত নফল। (আবু দাউদ)

ফায়দা : চল্লিশ দেহহামে এক উকিয়া হয় এবং প্রায় চার আনাতে এক দেহহাম হয়। সুতরাং এই হিসাব অনুযায়ী তিন হাজার রূপী হইয়াছে। ইহার মোকাবেলায় দোজাহানের বাদশাহের এরশাদ হইল, ইহা আর তেমন কি লাভ! প্রকৃত লাভ হইল যাহা চিরকাল বাকি থাকিবে; কোন দিন শেষ হইবে না। বাস্তবিকই যদি আমাদের ঈমান এইরূপ হইয়া যাইত এবং দুই রাকআত নামাযের তুলনায় তিন হাজার টাকা আমাদের নিকট কোনই মূল্য না রাখিত, তবেই আমরা জীবনের প্রকৃত স্বাদ অনুভব করিতে পারিতাম। আসলে নামায এমনই এক মূল্যবান সম্পদ। এই জন্যই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন চোখের শীতলতা ও তৃপ্তি নামাযের মধ্যে বলিয়া এরশাদ করিয়াছেন এবং ওফাতের সময় সর্বশেষ ওসিয়ত যাহা করিয়াছেন উহাতে নামাযের এহতেমামের হুকুম করিয়াছেন। (কানযুল উম্মাল)

বিভিন্ন হাদীসে উহার ওসিয়ত উল্লেখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে হযরত উম্মে সালামাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, জীবনের অন্তিম সময়ে যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জবান মোবারক হইতে ঠিকভাবে শব্দও উচ্চারিত হইতেছিল না; তখনও তিনি নামায ও গোলামের হক সম্বন্ধে তাকীদ করিয়াছিলেন। হযরত আলী (রাযিঃ) হইতেও নকল করা হইয়াছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের সর্বশেষ কথা ছিল নামাযের তাকীদ এবং গোলামের হক সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করার হুকুম। (জামে হগীর)

একদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নজ্দ অভিযুখে জেহাদের উদ্দেশ্যে একটি জামাত পাঠাইলেন। তাহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ গনীমতের মাল লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ইহা দেখিয়া লোকেরা বড় আশ্চর্য হইল যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় কামিয়াবী এবং এত মাল-সম্পদ লইয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, আমি কি তোমাদিগকে ইহা হইতেও কম সময়ে ও এই মাল ও গনীমত অপেক্ষা অধিক মাল ও গনীমত উপার্জনকারী জামাতের কথা বলিয়া দিব? তাহারা ঐ সকল লোক, যাহারা ফজরের নামায জামাআতে আদায় করে অতঃপর সূর্য উঠা

পর্যন্ত সেখানেই বসিয়া থাকে। সূর্য উঠিবার পর (যখন মাকরুহ সময় অর্থাৎ প্রায় বিশ মিনিট অতিবাহিত হইয়া যায় তখন) দুই রাকআত (ইশরাকের) নামায পড়ে। ইহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বেশী ধন-সম্পদ উপার্জনকারী।

বিখ্যাত বুয়ুর্গ সূফী হযরত শাকীক বলখী (রহঃ) বলেন যে, আমি পাঁচটি জিনিস তালাশ করিয়াছি এবং তাহা পাঁচ জায়গায় পাইয়াছি। (১) রুজীর বরকত চাশতের নামাযে। (২) কবরের জ্যোতি তাহাজ্জুদ নামাযে। (৩) মুনকার নাকীরের প্রশ্নের জওয়াব কুরআন তেলাওয়াতের মধ্যে। (৪) সহজে পুলছেরাত পার হওয়া রোযা ও ছদকার মধ্যে। (৫) আরশের ছায়া নির্জনতার মধ্যে। (নুযহাতুল-মাজালিস)

হাদীসের কিতাবসমূহে নামায সম্পর্কে বহু তাকীদ এবং নামাযের অনেক ফযীলত বর্ণিত হইয়াছে। এই সবগুলিকে একত্রিত করিয়া বর্ণনা করা দুর্লভ ব্যাপার। তবুও বরকতের জন্য কিছুসংখ্যক হাদীসের শুধু তরজমা পেশ করা হইল।

(১) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের উপর সর্বপ্রথম নামায ফরজ করিয়াছেন এবং কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযেরই হিসাব হইবে।

(২) নামাযের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, নামাযের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, নামাযের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর।

(৩) মানুষ ও শিরকের মধ্যে একমাত্র নামাযই হইল বাধা ও অন্তরায়। (৪) ইসলামের আলামত হইল নামায। যে ব্যক্তি দিলকে ফারেগ করিয়া সঠিক সময় ও মুস্তাহাবসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নামায পড়িবে সে প্রকৃত মুমিন।

(৫) আল্লাহ তায়ালা ঈমান ও নামাযের চাইতে শ্রেষ্ঠ কোন জিনিস ফরজ করেন নাই। যদি উহা হইতে উত্তম আর কোন জিনিস ফরজ করিতেন, তবে ফেরেশতাগণকে সেই কাজ করিবার জন্য হুকুম করিতেন। ফেরেশতাগণ দিব-রাত্রি কেহ রুকুতে আর কেহ সেজদায় আছেন।

(৬) নামায দ্বীনের খুঁটি।
(৭) নামায শয়তানের মুখ কালো করিয়া দেয়।
(৮) নামায মুমিনের নূর।
(৯) নামায শ্রেষ্ঠ জিহাদ।
(১০) যখন কোন ব্যক্তি নামাযে দাঁড়ায় তখন আল্লাহ তায়ালা তাহার দিকে পুরাপুরি মনোযোগ দেন। যখন সে নামায হইতে মনোযোগ সরাইয়া

নেয়, তখন আল্লাহ তায়ালাও মনোযোগ সরাইয়া নেন।

(১১) যখন কোন আসমানী বালা নাযিল হয়, তখন তাহা মসজিদ আবাদকারীদের হইতে সরিয়া যায়।

(১২) কোন কারণে যদি মানুষ জাহান্নামে যায়, তবে তাহার সেজদার জায়গাকে আগুন স্পর্শ করিবে না।

(১৩) আল্লাহ তায়ালা সেজদার জায়গাগুলিকে জাহান্নামের উপর হারাম করিয়া দিয়াছেন।

(১৪) সব চাইতে পছন্দনীয় আমল আল্লাহ তায়ালা নিকট ঐ নামায যাহা সময় মত আদায় করা হয়।

(১৫) আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাহার সকল অবস্থার মধ্যে এই অবস্থায় দেখিতে সবচেয়ে বেশী পছন্দ করেন যে, মানুষ সেজদায় পড়িয়া রহিয়াছে এবং কপাল মাটিতে ঘষিতেছে।

(১৬) সেজদার অবস্থায় মানুষ আল্লাহ তায়ালা সবচেয়ে বেশী নৈকট্য লাভ করে।

(১৭) নামায বেহেশতের চাবি।

(১৮) মানুষ যখন নামাযের জন্য দাঁড়ায় তখন জান্নাতের দরজাসমূহ খুলিয়া যায় এবং আল্লাহ তায়ালা ও নামাযী ব্যক্তির মধ্য হইতে পর্দাসমূহ সরিয়া যায় যতক্ষণ পর্যন্ত সে কাশি ইত্যাদির মধ্যে মশগুল না হয়।

(১৯) নামাযী ব্যক্তি শাহানশাহের দরজায় খটখটাইতে থাকে, আর স্বাভাবিক নিয়ম হইল, দরজা খটখটাইতে থাকিলে তাহা খুলিয়াই যায়।

(২০) দ্বীনের মধ্যে নামাযের মর্যাদা এমন, যেমন শরীরের মধ্যে মাথার মর্যাদা।

(২১) নামায দিলের নূর, যে ব্যক্তি নিজের দিলকে নূরানী বানাইতে চায় সে যেন নামাযের দ্বারা বানাইয়া লয়।

(২২) যে ব্যক্তি ভাল করিয়া ওয়ূ করে অতঃপর খুশু-খুযু সহকারে দুই রাকআত অথবা চার রাকআত ফরজ কিংবা নফল নামায পড়িয়া আল্লাহ তায়ালা দরবারে নিজের গোনাহসমূহের জন্য মাফ চায় আল্লাহ তায়ালা মাফ করিয়া দেন।

(২৩) জমিনের যে অংশের উপর নামায পড়িয়া আল্লাহ তায়ালাকে ইয়াদ করা হয় সেই অংশটি জমিনের অন্যান্য অংশের উপর গর্ব করে।

(২৪) যে ব্যক্তি দুই রাকআত নামায পড়িয়া আল্লাহ তায়ালা নিকট কোন দোয়া করে, সঙ্গে সঙ্গে হউক বা কোন কারণে দেবীতে হউক আল্লাহ তায়ালা সেই দোয়া অবশ্যই কবুল করিয়া নেন।

(২৫) যে ব্যক্তি নির্জনে দুই রাকআত নামায আদায় করে, যাহা আল্লাহ এবং ফেরেশতাগণ ব্যতীত আর কেহ জানিতে না পারে, সেই ব্যক্তি জাহান্নামের আগুন হইতে মুক্তির পরওয়ানা পাইয়া যায়।

(২৬) যে ব্যক্তি একটি ফরজ নামায আদায় করে, আল্লাহ তায়ালা দরবারে তাহার একটি দোয়া কবুল হইয়া যায়।

(২৭) যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামায এহতেমামের সহিত আদায় করিতে থাকে, রুকু সেজদা ওয়ূ ইত্যাদি এহতেমামের সহিত উত্তমরূপে পুরাপুরিভাবে আদায় করিতে থাকে, তাহার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হইয়া যায় এবং দোযখ তাহার জন্য হারাম হইয়া যায়।

(২৮) মুসলমান যতক্ষণ পর্যন্ত নামাযের এহতেমাম করিতে থাকে, শয়তান তাহাকে ভয় করিতে থাকে। আর যখন সে নামাযে গাফলতি করিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার উপর শয়তান সাহস পাইয়া যায় এবং তাহাকে বিপথগামী করার লোভ করিতে থাকে।

(২৯) সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আমল হইল আওয়াল ওয়াক্তে নামায পড়া।

(৩০) নামায প্রত্যেক পরহেজগার ব্যক্তির কুরবানীস্বরূপ।

(৩১) আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল হইল আওয়াল ওয়াক্তে নামায পড়া।

(৩২) যে সকালবেলায় নামায পড়িতে যায়, তাহার হাতে ঈমানের ঝাণ্ডা থাকে। আর যে বাজারে যায় তাহার হাতে শয়তানের ঝাণ্ডা থাকে।

(৩৩) যোহরের নামাযের আগে চারি রাকআত নামাযের সওয়াব এমন যেমন তাহাজ্জুদের চারি রাকআত নামাযের সওয়াব।

(৩৪) যোহরের পূর্বে চারি রাকআত নামায তাহাজ্জুদের চারি রাকআতের সমান বলিয়া গণ্য হয়।

(৩৫) মানুষ যখন নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হয় তখন আল্লাহর রহমত তাহার দিকে মনোযোগী হয়।

(৩৬) শ্রেষ্ঠতর নামায হইল মধ্যরাত্রির নামায, কিন্তু এই নামায আদায়কারীর সংখ্যা অনেক কম।

(৩৭) আমার নিকট হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আসিয়া বলিতে লাগিলেন, হে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি যতদিনই বাঁচিয়া থাকুন না কেন একদিন আপনাকে মৃত্যুবরণ করিতে হইবে, আর যাহাকে ইচ্ছা ভালবাসুন না কেন একদিন আপনাকে তাহার নিকট হইতে পৃথক হইতে হইবে, আর ভাল-মন্দ যে আমলই আপনি করুন না কেন উহার বদলা অবশ্যই পাইবেন। ইহাতে কোন সন্দেহ

নাই যে, মুমিনের শরাফত ও বুয়ুর্গী তাহাজ্জুদ নামাযের মধ্যে এবং মুমিনের ইজ্জত ও সম্মান অন্যের মুখাপেক্ষী না হওয়ার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

(৩৮) শেষ রাত্রে দুই রাকআত নামায সমস্ত দুনিয়া হইতে শ্রেষ্ঠ। কষ্টের আশংকা না হইলে আমি ইহা উম্মতের উপর ফরজ করিয়া দিতাম।

(৩৯) তাহাজ্জুদ নামায অবশ্যই পড়। কেননা, ইহা নেক বান্দাদের তরীকা এবং আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের উপায়। তাহাজ্জুদ গোনাহ হইতে বিরত রাখে এবং গোনাহ মাফ হওয়ার উপায়। ইহাতে শারীরিক সুস্থতাও লাভ হয়।

(৪০) আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিতেছেন, হে আদমসন্তান! দিনের শুরুতে তুমি চারি রাকআত নামায আদায়ে অক্ষম হইও না। আমি সারাদিন তোমার যাবতীয় কাজ সমাধা করিয়া দিব।

হাদীসের কিতাবসমূহে নামাযের ফযীলত ও নামাযের প্রতি উৎসাহদান প্রসঙ্গে বহু হাদীসের উল্লেখ রহিয়াছে। চল্লিশের সংখ্যা পূরণের উদ্দেশ্যে এই হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হইল। যাহাতে চল্লিশ হাদীসের বিশেষ ফযীলত হাসিল করিবার জন্য কেহ এইগুলি মুখস্থ করিয়া লইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে নামায এমনই এক বিরাট সম্পদ যে, ইহার মর্যাদা একমাত্র সেই ব্যক্তিই রক্ষা করিতে পারে যাহাকে আল্লাহ তায়ালা এই নামাযের স্বাদ গ্রহণ করাইয়াছেন। নামাযের এহেন মর্যাদার কারণেই হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযকে আপন চোখের শীতলতা বলিয়াছেন আর এই স্বাদের দরুনই হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত্রে অধিকাংশ সময় নামাযের মধ্যে অতিবাহিত করিয়া দিতেন। আর এই কারণেই হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতের সময় বিশেষভাবে নামাযের জন্য ওসিয়ত করিয়াছেন এবং এহতেমামের সহিত উহা আদায় করিবার জন্য তাকীদ করিয়াছেন।

বিভিন্ন হাদীস শরীফে নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করা হইয়াছে : اَتَقْرَأُ اللَّهَ فِي الصَّلَاةِ অর্থাৎ, নামাযের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করিতে থাক।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করিয়াছেন যে, সমস্ত আমলের মধ্যে আমার নিকট নামাযই সবচেয়ে প্রিয় আমল।

এক সাহাবী (রাযিঃ) বলেন, এক রাত্রে আমি মসজিদে নববীর নিকট দিয়া যাইতেছিলাম ; হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়িতেছিলেন। আমি আগ্রহের সহিত হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের পিছনে নামাযের নিয়ত বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া গেলাম। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরায়ে বাকারা তেলাওয়াত করিতেছিলেন। আমি মনে করিলাম যে, তিনি একশত আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত করিয়া রুকু করিবেন। কিন্তু যখন তিনি একশত আয়াত পাঠ করিয়া রুকু করিলেন না তখন আমি মনে করিলাম, দুইশত আয়াত পর্যন্ত তেলাওয়াত করিয়া রুকু করিবেন। কিন্তু সেখানেও তিনি রুকু করিলেন না। তখন আমি মনে করিলাম, সূরা শেষ করিয়া রুকু করিবেন। কিন্তু যখন সূরা শেষ হইল তখন হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকবার ‘আল্লাহুম্মা লাকাল-হামদ’ পড়িলেন অতঃপর সূরা আলি-ইমরান শুরু করিয়া দিলেন। ইহাতে আমি চিন্তায় পড়িয়া গেলাম। অবশেষে মনে করিলাম যে, সূরায়ে আলি-ইমরান শেষ করিয়া তো অবশ্যই রুকু করিবেন। কিন্তু হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহাও শেষ করিলেন এবং তিনবার ‘আল্লাহুম্মা লাকাল-হামদ’ পড়িয়া সূরায়ে মায়দা শুরু করিয়া দিলেন। অতঃপর এই সূরা শেষ করিয়া রুকু করিলেন। রুকুর মধ্যে ‘সুবহানা রাবিয়াল আজীম’ পড়িতে থাকিলেন এবং ইহার সঙ্গে আরও কিছু পড়িতেছিলেন যাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। অতঃপর সেজদায় যাইয়াও পূর্বের মত ‘সুবহানা রাবিয়াল আজীম’ পড়িতেছিলেন এবং ইহার সঙ্গে আরও কিছু পড়িতেছিলেন।

অতঃপর দ্বিতীয় রাকআতে সূরায়ে আনআম শুরু করিয়া দিলেন। আমি আর হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়িবার হিম্মত করিতে পারিলাম না। অবশেষে বাধ্য হইয়া চলিয়া আসিলাম। প্রথম রাকআতে প্রায় পাঁচ পারা হইয়াছে। তদুপরি হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পড়াও একেবারে ধীরে ধীরে তাজবীদ ও তারতীলের সহিত—প্রত্যেক আয়াতকে তিনি পৃথক পৃথক করিয়া তেলাওয়াত করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। এমতাবস্থায় নামাযের রাকআত কতই না লম্বা হইয়াছিল! এইসব কারণেই নামায পড়িতে পড়িতে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পা মোবারক ফুলিয়া যাইত! কিন্তু যে জিনিসের স্বাদ একবার অন্তরে স্থান করিয়া লয় উহাতে কষ্ট ও পরিশ্রম করা কঠিন মনে হয় না।

আবু ইসহাক সুবাইহী (রহঃ) বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। একশত বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করিয়াছেন। তিনি আফসোস করিতেন, হায়! বার্ধক্য ও দুর্বলতার কারণে এখন আর নামাযের স্বাদ পাই না ; দুই রাকআতে শুধুমাত্র সূরায়ে বাকারা ও সূরায়ে আলি-ইমরান এই দুইটি

সূরা-ই পড়িতে পারি—ইহার বেশী পড়িতে পারি না। উল্লেখ্য যে, এই দুইটি সূরা পৌনে চার পারার সমান।

মুহাম্মদ ইবনে সিমাক (রহঃ) বলেন, কুফা নগরে আমার একজন প্রতিবেশী ছিল। তাহার একটি ছেলে দিনের বেলায় সব সময় রোযা রাখিত এবং রাতভর নামায পড়িত ও ভাবপূর্ণ কবিতা পাঠে মশগুল থাকিত। ছেলেটি শুকাইয়া এমন হইয়া গিয়াছিল যে, শরীরে হাড়ি ও চামড়াটুকুই বাকী ছিল। তাহার পিতা একদিন আমাকে ছেলেটিকে বুঝাইতে বলিলেন। অতঃপর আমি একদিন আমার বাড়ীর দরজায় বসিয়া ছিলাম; সে আমার সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিলে আমি তাহাকে ডাকিলাম। সে আসিল এবং সালাম দিয়া আমার নিকট বসিল। আমি আমার কথা আরম্ভ করিতেই সে বলিতে লাগিল, চাচা! আপনি হয়তো আমাকে পরিশ্রম কম করিবার পরামর্শ দিবেন। চাচাজান! আমি এই মহম্মার কয়েকজন ছেলের সহিত এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, দেখা যাক আমাদের মধ্যে কে বেশী এবাদত করিতে পারে। তাহারা চেষ্টা ও মেহনত করিয়াছে এবং তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার দরবারে ডাকিয়া লওয়া হইয়াছে। যখন তাহাদের ডাক আসিল, তাহারা অতি আনন্দের সহিত চলিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে আমি ব্যতীত আর কেহ অবশিষ্ট নাই। আমার আমল প্রতিদিন দুইবার তাহাদের সামনে প্রকাশ হইয়া থাকিবে, কাজেই উহাতে কম হইলে তাহারা কি মনে করিবে! চাচাজান! ঐ সকল যুবকরা বড় সাধনা করিয়াছে। এই বলিয়া সে তাহাদের মেহনত-মুজাহাদার বিবরণ দিতে লাগিল। বিবরণ শুনিয়া আমরা হতভম্ব হইয়া গেলাম। অতঃপর সেই ছেলে উঠিয়া চলিয়া গেল। তৃতীয় দিন আমরা শুনিলাম যে, এই ছেলেটিও দুনিয়া হইতে বিদায় নিয়াছে। আল্লাহ তাহার উপর অফুরন্ত রহমত নাযিল করুন। বর্তমান অধঃপতনের যুগেও আল্লাহর এমন সব বান্দা দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা রাত্রের অধিকাংশ সময়ই নামাযের মধ্যে কাটাইয়া দেন এবং দিনের বেলায় দ্বীনের অন্যান্য কাজ তালীম তবলীগ ইত্যাদির মধ্যে মনোনিবেশ করেন।

হযরত মুজাদ্দের আল্ফে সানী (রহঃ)এর নাম শুনে নাই হিন্দুস্থানে এমন কে আছে—তাহারই একজন বিশিষ্ট খলীফা মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ লাহোরী (রহঃ) একদিন বলিয়া উঠিলেন, বেহেশতে কি নামায হইবে না? কেহ উত্তর করিল, বেহেশতে নামায কেন হইবে, উহা তো আমলের বদলা দেওয়ার স্থান, আমল করার স্থান নয়। ইহা শুনিয়া তিনি আ-হ্ বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, হায় আফসোস! নামায

ছাড়া বেহেশতে কিভাবে সময় কাটিবে। বস্তুতঃ এইসব লোকের ওসীলাতেই দুনিয়া কায়ম রহিয়াছে এবং তাঁহারাই সার্থক জীবন লাভ করিয়াছেন। আল্লাহ পাক তাঁহার মাহবুব বান্দাদের ওসীলায় এই অধমের প্রতিও যদি কিছুটা রহমতের দৃষ্টি করেন, তবে তাঁহার সীমাহীন রহমতের কাছে অসম্ভব কিছুই নয়।

এখানে একটি সুন্দর ঘটনা উল্লেখ করিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ করিতেছি। হাফেজ ইবনে হজর (রহঃ) মুনাবেহাত কিতাবে লিখিয়াছেন, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন : এই দুনিয়াতে তিনটি জিনিস আমার প্রিয়—খুশবু, নারী আর নামাযে আমার চোখের শীতলতা। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তখন কয়েকজন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) বলিলেন, আপনি সত্য বলিয়াছেন, আমার নিকটও তিনটি জিনিস প্রিয়—আপনার চেহারা মুবারক দেখা, আমার অর্থ-সম্পদ আপনার জন্য খরচ করা এবং আমার কন্যা আপনার বিবাহে রহিয়াছে।

হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, আপনি সত্য বলিয়াছেন, আমার নিকটও তিনটি জিনিস প্রিয়—সৎ কাজে আদেশ, অসৎ কাজে নিষেধ এবং পুরাতন কাপড় পরিধান করা।

হযরত উসমান (রাযিঃ) বলিলেন, আপনি সত্য বলিয়াছেন। আমার নিকটও তিনটি জিনিস প্রিয়—ক্ষুধার্তকে খাওয়ানো, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করা এবং কুরআন পাকের তেলাওয়াত।

হযরত আলী (রাযিঃ) বলিলেন, আপনি সত্য বলিয়াছেন, আমারও তিনটি জিনিস প্রিয়—মেহমানের খেদমত, গরমের দিনে রোযা রাখা এবং দুশমনের উপর তলোয়ার চালানো।

এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আঃ) তশরীফ আনিলেন এবং আরজ করিলেন, আমাকে আল্লাহ তায়ালা পাঠাইয়াছেন। অতঃপর বলিলেন যে, আমি (জিবরাঈল) যদি দুনিয়াবাসীদের একজন হইতাম তবে কি পছন্দ করিতাম, বলিব কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, বলুন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) আরজ করিলেন, পথহারাদের পথের সন্ধান দেওয়া, গরীব এবাদতকারী লোকদেরকে মহব্বত করা এবং সন্তান-সন্ততিওয়ালা গরীব লোকদেরকে সাহায্য করা। আর আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের তিনটি কাজ পছন্দ করেন—জান-মালের শক্তি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা, গোনাহের জন্য অনুতাপ হইয়া ক্রন্দন করা এবং ক্ষুধার্ত অবস্থায় হাব্বর করা।

হাফেজ ইবনে কাইয়িম (রহঃ) 'যাদুল-মাআদ' কিতাবে লিখিয়াছেন, নামায রুজী আকর্ষণ করে, স্বাস্থ্য রক্ষা করে, রোগ-ব্যাদি দূর করে, অন্তরকে শক্তিশালী করে, চেহারার নূর ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, মনে আনন্দ দেয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সজীবতা আনে, অলসতা দূর করে, অন্তর খুলিয়া দেয়। নামায রুহের খোরাক, দিলকে নূরানী করে, আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতকে রক্ষা করে, আল্লাহর আজাব হইতে বাঁচাইয়া রাখে, শয়তানকে দূর করিয়া রাখে, রহমানের সহিত নৈকট্য সৃষ্টি করে। মোটকথা দেহ এবং আত্মার সুস্থতা রক্ষার জন্য নামাযের বিশেষ দখল ও আশ্চর্যজনক তাহীর রহিয়াছে। ইহা ছাড়া দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় ক্ষতি ও অনিষ্ট দূরীকরণ ও দোজাহানের যাবতীয় কল্যাণ সাধনে নামাযের বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নামায না পড়ার ভয়াবহ পরিণতি এই সম্পর্কিত হাদীসসমূহের বিবরণ

হাদীসের কিতাবসমূহে নামায না পড়ার উপর কঠিন কঠিন আজাব ও শাস্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। নমুনাস্বরূপ কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হইতেছে। সত্য সংবাদদাতা হযরত নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীসই বুদ্ধিমান ও বিবেকসম্পন্ন লোকের জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু উম্মতের প্রতি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়া ও মহব্বতের উপর কুরবান হইয়া যাওয়া উচিত যে, তিনি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য বিভিন্নভাবে বারবার আমাদের সাবধান করিয়াছেন। যাহাতে তাঁহার নামের ধারক বাহক উম্মত যেন নামাযের ব্যাপারে কোনরূপ ত্রুটি না করে। কিন্তু আফসোস আমাদের অবস্থার উপর যে, হুযূরের এই পরিমাণ এহতেমাম সত্ত্বেও আমরা নামাযের প্রতি কোন গুরুত্বই দেই না। আবার নিজেদেরকে নির্লজ্জভাবে হুযূরের উম্মত ও তাহার অনুসারী এবং ইসলামের একমাত্র স্বত্বাধিকারী মনে করিয়া থাকি।

حضور قدس على الله وسلم كإرشاد
نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک جگہ
إرشاد ہے کہ بندہ کو اگر کفر کو لانے والی چیز صرف
نماز چھوڑنا ہے ایک جگہ إرشاد ہے کہ ایمان اور

① عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سَلَّمَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ
تَرْكُ الصَّلَاةِ۔ رواه أحمد ومسلم

وَقَالَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ
كَفَرُكَ دَرْمِيَانِ نَمَاز چھوڑنے کا فرق ہے۔
تَرْكُ الصَّلَاةِ۔

(ابوداؤد والنسائی ولفظه ليس بين العبد وبين الكفر الا ترك الصلوة والترمذی ولفظه قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلوة كذا في التزيين للسندى وقال السيوطی في الدر الحديث جابر أخرجه ابن الجشبية واحمد ومسلم وابدوداؤد والترمذی والنسائی وابن ماجه ثم قال واخرج ابن ابى شيبة واحمد وابدوداؤد والترمذی وصححه والنسائی وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه عن بريدة مرفوعاً اللهم الذي بيننا وبينهم الصلوة فمن تركها فقد كفر)

① হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, নামায ছাড়িয়া দেওয়া মানুষকে কুফরের সহিত মিলাইয়া দেয়। অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে যে, বান্দা এবং কুফরকে মিলানোর বস্তু একমাত্র নামায ছাড়িয়া দেওয়া। আরেক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হইল নামায ত্যাগ করা। (তারগীব)

ফায়দা : এইরূপ বর্ণনা আরও কতিপয় হাদীসে আসিয়াছে। এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে জলদি নামায পড়িয়া লও। কেননা নামায ত্যাগ করিলে মানুষ কাফের হইয়া যায়। অর্থাৎ এমন যেন না হয় যে, মেঘের কারণে নামাযের ওয়াজের খবর হইল না এবং নামায কাযা হইয়া গেল। ইহাকেও নামায ত্যাগ করা বলিয়াছেন। কত বড় কঠিন কথা যে, আল্লাহর নবী নামায ত্যাগকারীর উপর কুফরের হুকুম লাইতেছেন। যদিও ওলামায়ে কেরাম এই হাদীসে 'নামায ত্যাগ করা'র অর্থ 'নামাযকে অস্বীকার করা' বুঝাইয়াছেন, তথাপি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের মর্ম ও গুরুত্ব এত অপরিমিত যে, যাহার অন্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আজমত ও মর্যাদার সামান্যতম অনুভূতিও থাকিবে সে ইহার মূল্য বুঝিতে পারিবে এবং তাহার নিকট ইহা অত্যন্ত মারাত্মক বলিয়া মনে হইবে। ইহা ছাড়া বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম যেমন হযরত ওমর, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখের অভিমতও এই যে, বিনা ওজরে জানিয়া শুনিয়া নামায ত্যাগকারী কাফের। ইমামগণের মধ্যে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ

ও ইবনে মুবারক (রহঃ) এরও অভিমত ইহাই বর্ণনা করা হয়। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। (তারগীব)

۲) عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ
أَوْصَانِي خَلِيلِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ خَصَالٍ فَقَالَ
لَا تَشْرُوكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَقُطَعُ أَرْ
حَافَتَهُ أَوْ صُلْبَتَهُ وَلَا تَرْكُوا الصَّلَاةَ
مُعَوَّدِينَ فَمَنْ تَرَكَهَا مُعَوَّدًا فَقَدْ
خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ وَلَا تَرْكَبُوا النُّعْصَةَ
فَإِنَّهَا سَخَطُ اللَّهِ وَلَا تَشْرُكُوا الْخَيْرَ
فَإِنَّهَا أَرْسُ الْخَطَايَا كُلِّهَا .

المحدث رواه الطبراني ومحمد بن نصر في كتاب الصلوة باسنادين لا باس بهما كذا
 في الترغيب وهكذا ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزه اليهما في المشكاة برواية
 ابن حبان عن ابن ابي الدرداء نحوه

(২) হযরত উবাদাহ্ (রাযিঃ) বলেন, আমাকে আমার প্রিয় হাবীব হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতটি নসীহত করিয়াছেন। তন্মধ্যে চারটি এই— (১) তুমি আল্লাহর সহিত কাহাকেও শরীক করিও না ; যদিও তোমাকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলা হয় কিংবা তোমাকে আগুনে জ্বালাইয়া দেওয়া হয় অথবা তোমাকে শূলিতে চড়ানো হয়। (২) ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করিও না ; কেননা যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করে, সে দ্বীন হইতে বাহির হইয়া যায়। (৩) আল্লাহ তায়ালার না-ফরমানী করিও না। কেননা, ইহাতে আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টি হন। (৪) শরাব পান করিও না। কেননা, ইহা যাবতীয় পাপ কাজের মূল।

(তারগীব : তাবারানী)

ফায়দা : অন্য এক হাদীসে হযরত আবু দারদা (রাঃ) হইতেও এইরূপ রেওয়াজাত বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন, আমাকে আমার প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওছিয়ত করিয়াছেন যে, আল্লাহর সাথে কাহাকেও শরীক করিও না ; যদিও তোমাকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলা হয় কিংবা তোমাকে আগুনে জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ

ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করিও না। কেননা, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ত্যাগ করে, তাহার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কোন জিস্মাদারী নাই। তৃতীয়তঃ শরাব পান করিও না। কারণ ইহা সকল পাপকাজের চাবি।

(۳) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ
أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ بِعَشْرٍ كَلِمَاتٍ قَالَ لَا تَشْرُكَ بِاللَّهِ
شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ وَلَا تَقْتُلْ
وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَكَ أَنْ تَكْفُرَ مِنْ
أَمْلِكَ وَمَالِكَ وَلَا تَكُنْ مِنْ صُلُوةٍ
مَكْتُوبَةٍ مُتَعَبِّدًا فَإِنْ مَنَ تَرَكَ
صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَبِّدًا فَقَدْ بَرَكْتَ
مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَلَا تَشْنِ بَيْنَ خَلٍّ فَإِنَّهُ
دَائِسٌ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَإِيَّاكَ وَ
الْعَصِيَّةَ فَإِنَّ بِالْعَصِيَّةِ حَلَّ سَخَطِ
اللَّهِ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الرَّحْفِ
وَلَا تَهْلِكِ النَّاسُ وَإِنْ أَصَابَ النَّاسُ
مَوْتُ فَانْبِتْ وَانْبِتْ عَلَى أَهْلِكَ
مِنْ طَوْلِكَ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ
أَدْبًا وَاجْهَمْ فِي اللَّهِ .

رواه احمد والطبراني في الكبير واسناد احمد صحيح نوسلم من الانقطاع فان
عبد الرحمن ابن جبيل لو يسع من معاذ كذا في الترغيب واليهما عراه السلمي
في الدرر لو يذكر الانقطاع ثبوته قال واخرج الطبراني عن اميمة مولاة رسول الله
صلى الله عليه وسلم قالت كنت اصعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وضوءه فدخل رجل فقال اوصني فقال لا تشرك بالله شيئا وان قطعت اومقت
ولا تقص والدريك وان امراك ان تغلى من اهلك ودينك فتخله ولا تشرب
خمرًا فانه مفتاح كل شر ولا تترك صلوة متعمدا فمن فعل ذلك فقد
برأت منه ذمة الله ورسوله

৩) হযরত মুআয (রাযিঃ) বলেন, আমাকে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশটি বিষয়ের ওসিয়ত করিয়াছেন :

(১) আল্লাহর সঙ্গে কাহাকেও শরীক করিও না ; যদিও তোমাকে কতল করা হয় কিংবা আগুনে জ্বালাইয়া দেওয়া হয়।

(২) পিতামাতার নাফরমানী করিও না ; যদিও তাহারা তোমাকে স্ত্রী অথবা সমুদয় ধন-সম্পদ ত্যাগ করিতে বলেন।

(৩) ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ নামায ত্যাগ করিও না। কারণ, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ফরজ নামায ত্যাগ করে তাহার প্রতি আল্লাহ তায়ালা কোন জিন্মাদারী থাকে না।

(৪) শরাব পান করিও না। কারণ, ইহা যাবতীয় মন্দ ও নিলজ্জ কাজের মূল।

(৫) আল্লাহ তায়ালা ন-ফরমানী করিও না। কারণ, ইহাতে আল্লাহ তায়ালা গজব নাযিল হয়।

(৬) জেহাদ হইতে পলায়ন করিও না ; যদিও তোমার সকল সাথী মারা যায়।

(৭) যদি কোন এলাকায় মহামারী ছড়াইয়া পড়ে (যেমন প্লেগ ইত্যাদি), তবে সেখান হইতে পলায়ন করিও না।

(৮) নিজ পরিবারের লোকদের জন্য সাধ্যমত খরচ করিও।

(৯) তাহাদের উপর হইতে শাসনের লাঠি হটাঁইও না।

(১০) তাহাদিগকে আল্লাহর ভয় দেখাইতে থাকিও।

(তারগীব : আহমদ, তাবারানী)

ফায়দা : লাঠি না হটানোর অর্থ হইল, সন্তানরা যাহাতে বে-ফিকির না হইয়া যায় যে, পিতা যখন শাসন করিতেছেন না বা মারধর করিতেছেন না, কাজেই যাহা ইচ্ছা করিতে থাকি। অতএব শরীয়তের সীমার ভিতর থাকিয়া কখনও কখনও মারধর করা চাই। কেননা, মারধর ব্যতীত অধিকাংশ ক্ষেত্রে সন্তানের শাসন হয় না। আজকাল প্রথম অবস্থায় সন্তানদেরকে মহব্বতের জোশে শাসন করা হয় না। পরবর্তীতে যখন তাহারা বদ অভ্যাসে পাকা হইয়া যায় তখন কাঁদিয়া বেড়ায়। অথচ সন্তানকে মন্দকাজ হইতে বাধা না দেওয়া ও মারধর করাকে মহব্বতের খেলাফ মনে করা তাহার সহিত মহব্বত নহে বরং শক্ত দুশমনী। এমন বুদ্ধিমান কে আছে যে কষ্ট পাইবে মনে করিয়া আপন সন্তানের ফৌড়ার অপারেশন করায় না? বরং ছেলে যতই কান্নাকাটি করুক, চেহারা বিকৃত করুক, ভাগিয়া যাওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, অপারেশন করাইতেই হয়।

বহু হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করা হইয়াছে যে, সন্তানকে সাত বৎসর বয়সে নামাযের হুকুম কর এবং দশ বৎসর বয়সে নামায না পড়ার দরুন মারপিট কর। (দুররে মানসুর)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, বাচ্চাদের নামাযের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখ এবং তাহাদিগকে ভাল কথা ও ভাল অভ্যাস শিক্ষা দাও। হযরত লোকমান হাকীম (আঃ) বলিয়াছেন, পিতার মারধর সন্তানের জন্য এমন যেমন ক্ষেতের জন্য পানি। (দুররে মানসুর) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, সন্তানকে শাসন করা আল্লাহর রাস্তায় এক ছা' (অর্থাৎ সাড়ে তিন সের) পরিমাণ সদকা করা হইতেও উত্তম। (দুররে মানসুর) এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির উপর রহমত নাযিল করুন, যে পরিবারের লোকদের শাসনের উদ্দেশ্যে ঘরে চাবুক লটকাইয়া রাখে। এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, কোন পিতা সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার সমতুল্য পুরস্কার আর কিছুই দিতে পারে না। (জামে সগীর)

عَنْ زَوْكَلِ بْنِ مُعَوِيَّةَ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ فَاتَتْهُ صَلَوةٌ فَكَأَنَّمَا وَزَرَ
أَهْلَهُ وَمَالَهُ .
مَنْ شُغِبَ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ شَيْءٍ
كَرِهَ شَيْءٌ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ كَرِهٌ
يَسْبَغُ كَرِهًا اسْكِرْ كَرِهًا كَرِهًا
دَوْلَتِ سَبِّ حَمِيمٍ لِيَاكُلُوا

إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَبَانٍ فِي مَصْنُوعِهِ كَذَا فِي التَّرْغِيبِ زَادَ السِّيَاطِي فِي الدَّرَرِ لِلنَّسَائِيِّ اِيضًا قَالَتْ
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مَسْنَدِهِ

৪) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে-ব্যক্তির এক ওয়াক্ত নামায ছুটিয়া গেল, তাহার যেন পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ সবকিছুই লুট হইয়া গেল। (তারগীব : ইবনে হিব্বান)

ফায়দা : সাধারণতঃ সন্তান-সন্ততির কারণে—তাহাদের খোঁজ-খবর নেওয়ার মধ্যে মশগুল থাকার কারণে নামায নষ্ট করা হয়। কিংবা ধন-সম্পদ কামাইয়ের লোভে নষ্ট করা হয়। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নামায নষ্ট করার পরিণতি এমনই যেমন সন্তান-সন্ততি ও মাল-সম্পদ সবকিছুই লুট হইয়া গেল এবং সে একা রহিয়া গেল। অর্থাৎ এই অবস্থায় যত বড় ক্ষতি ও লোকসান হয়, নামায ছুটিয়া গেলেও তদ্রূপ হয়। অথবা ঐ অবস্থায় যে পরিমাণ দুঃখ-কষ্ট ও মনে ব্যথা হয়, নামায ছুটিয়া গেলে তদ্রূপ হওয়া চাই। যদি কোন বিশ্বস্ত

ব্যক্তি কাহাকেও এই মর্মে সাবধান করিয়া দেয় এবং তাহার বিশ্বাসও হয় যে, এই পথে ডাকাতরা লুটতরাজ করে, রাত্রে যাহারা এই রাস্তা দিয়া যায় ডাকাতরা তাহাদেরকে কতল করিয়া দেয় এবং মালামাল লুট করিয়া নেয়, তবে এমন বীরপুরুষ কে আছে যে রাত্রিবেলায় এই পথে যাইবে। রাত্রে তো দূরের কথা দিনের বেলায়ও এই পথে যাওয়ার সাহস করিবে না। অথচ আল্লাহর প্রিয় সত্যবাদী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই পবিত্র বাণী এক দুইটি নহে বরং বহুসংখ্যক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আফসোস! ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যবাদী হওয়ার দাবীও আমরা আমাদের মিথ্যা জবানে করি; কিন্তু তাঁহার এই পবিত্র বাণীর কী প্রতিক্রিয়া আমাদের উপর হয়—তাহা সকলেরই জানা আছে।

(৫) عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَنَّ بَيْنَ الصَّلَاةَيْنِ مِنْ عَشِيرَةٍ عَذِرَ فَقَدْ أَتَى أَبَا وَمِنْ الْوَأَبِ الْكَبَّارِ
 نَبِيُّ أَكْرَمَ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَارِشَابِ بَيْتِ كَبُجُو
 شَخْصٌ دُونَ مَا زُولَ كُوبَلَا كُوسَى عَذَرَ كَيْ كَيْ قَيْت
 مِينَ بِرُطْمِ وَهْ كَبِيرَهْ كَمَا هُيُوهْ كَيْ دُرَا زُولِ مِينَ
 سَيْ كَيْ دُرَا زُولِ بِرُطْمِ كَيْ

রওাহ হাকম ওয়াল হশ হুওয়ান ফিস ত্তে ওয়াল হাফয বদ ওাহ বস্ৰে লাফলহু হুদ
 অত্ফে গিরহস্বিন বন নমিরকডা ফি ত্তেগিব রাড সিউটি ফি দর ত্তেমডি ইয়না
 ডকরি অল্লামী লে শোহদ ওকডা ফি ত্তেগিব ওয়াল হাদিথ অগ্রহে ত্তেমডি ওয়াল
 হশ জুইফ জুইফে হুদ ওগিরে ওয়াল ওমল ওয়াল হুদ ওয়াল হুদ ওয়াল হুদ ওয়াল
 ইলি হাদিথ ওয়াল হুদ ওয়াল হুদ ওয়াল হুদ ওয়াল হুদ ওয়াল হুদ ওয়াল হুদ
 হাদিথ ওয়াল হুদ ওয়াল হুদ ওয়াল হুদ ওয়াল হুদ ওয়াল হুদ ওয়াল হুদ

(৫) নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি শরীয়তসম্মত ওজর ব্যতীত দুই ওয়াক্ত নামায একসঙ্গে পড়িল, সে কবীরা গোনাহের দরজাসমূহের মধ্য হইতে একটিতে প্রবেশ করিল।

(তারগীব : হাকিম, দুররে মানসূর : তিরমিযী)

ফায়দা : হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তিন কাজে বিলম্ব করিও না।

প্রথম : নামায, যখন উহার সময় হইয়া যায়।

দ্বিতীয় : জানাযা, যখন উহা তৈয়ার হইয়া যায়।

তৃতীয় : অবিবাহিতা নারী, যখন তাহার উপযুক্ত স্বামী মিলিয়া যায়।
 (অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ দিয়া দাও) অনেক লোক যাহারা নিজদিগকে

দীনদারও মনে করে এবং নামাযের পাবন্দি করে বলিয়াও মনে করে, তাহারা সফর অথবা দোকান বা চাকুরী ইত্যাদি কাজের সামান্য অজুহাতে কয়েক ওয়াক্ত নামায একত্রে ঘরে আসিয়া পড়িয়া নেয়—অসুস্থতা বা অন্য কোন ওজর ব্যতীত নামাযকে সময় মত না পড়া কবীরা গোনাহ। যদিও একেবারে নামায না পড়ার সমান গোনাহ না হউক। সময় মত নামায না পড়াও কঠিন গোনাহ, এই গোনাহ হইতে সে রক্ষা পাইল না।

(৬) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ مَنْ حَافِظَ عَلَيْهَا كَأَنَّكَ لَتَنُورُ أَزْوَاجًا وَ نَجَاةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يَحْفَظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَجَاةٌ وَ كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ ابْنِ بْنِ خَلْفٍ
 ایک مَرَّةً مَحْضُورًا قَدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص
 نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لئے قیامت
 کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے
 کے وقت نجات ہوگی اور نجات کا سبب
 ہوگی اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس
 کیلئے قیامت کے دن نور ہوگا اور اس
 کے پاس کوئی نجات ہوگی اور نہ نجات ہوگی
 ذریعہ اس کا شرف فرعون ہامان اور ابْنِ بْنِ خَلْفٍ کے ساتھ ہوگا۔

রাخجہ احمد و ابن حبان والطبرانی كذا في الدر المنثور للسيوطي وقال الهيثمي
 رواه احمد والطبرانی في الكبير والوسط ورجال احمد ثقات وقال ابن حجر في
 الزواجر اخرج احمد بسند جيد وزاد فيه قارون ايضا مع فرعون وغيره وكذا
 زاده في منتخب الكنز برواية ابن نصر والمشكوة ايضا برواية احمد والدارمي
 والبيهقي في الشعب وابن قيعم في كتاب الصلوة

(৬) একদিন ছয় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের বিষয় উল্লেখ করিয়া এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি নামাযের এহতেমাম করে, তাহার জন্য নামায কিয়ামতের দিন নূর হইবে এবং হিসাবের সময় দলীল হইবে এবং নাজাতের উপায় হইবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের এহতেমাম করে না, কিয়ামতের দিন নামায তাহার জন্য নূর হইবে না, আর তাহার নিকট কোন দলীলও থাকিবে না এবং নাজাতের জন্য কোন উপায়ও হইবে না। এইরূপ ব্যক্তির হাশর ফেরআউন, হামান ও উবাই ইবনে খলফের সহিত হইবে। (দুররে মানসূর, আহমদ, ইবনে হিব্বান, তাবারানী)

ফায়দা : ফেরআউন যে কত বড় কাকের ছিল তাহা সকলের জানা আছে। এমনকি সে খোদায়ী দাবী করিয়াছিল। আর হামান হইল তাহার

মন্ত্রীর নাম। আর উবাই ইবনে খলফ মক্কার মুশরিকদের মধ্যে ইসলামের জঘন্যতম দূশমন ছিল। হিজরতের পূর্বে সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিত, আমি একটি ঘোড়া পালিতেছি এবং উহাকে অনেক কিছু খাওয়াইতেছি। উহার উপর আরোহণ করিয়া আমি তোমাকে হত্যা করিব (নাউযু বিল্লাহ)। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাহাকে বলিয়াছিলেন, ইনশাআল্লাহ আমিই তোমাকে কতল করিব। উভদের যুদ্ধে সে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তালাশ করিতেছিল আর বলিতেছিল, আজ যদি তিনি বাঁচিয়া যান তবে আমার আর রক্ষা নাই। অতএব হামলা করার উদ্দেশ্যে সে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হইয়া গেল। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) এরা দাও করিয়াছিলেন যে, দূর হইতেই তাহাকে শেষ করিয়া দিবেন কিন্তু হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, তাহাকে আসিতে দাও। সে যখন নিকটবর্তী হইল, তখন হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীর হাত হইতে একটি বর্শা লইয়া তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। যাহা তাহার ঘাড়ে গিয়া লাগিল এবং ঘাড়ের উপর সামান্য আঁচড়ের ন্যায় ক্ষত হইল। এই সামান্য আঘাতেই সে ঘোড়া হইতে গড়াইয়া পড়িয়া গেল এবং এইভাবে কয়েকবার পড়িল। দ্রুত ছুটিয়া আপন দলের নিকট পৌঁছিয়া গেল এবং চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে কতল করিয়া দিয়াছে। দলের কাফেররা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, সামান্য আঁচড় লাগিয়াছে; চিন্তার কোন কারণ নাই। কিন্তু সে বলিতেছিল যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কায় আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আমি তোমাকে কতল করিব। খোদার কসম, মুহাম্মদ যদি আমার উপর থুথুও নিক্ষেপ করিতেন তবু আমি মরিয়া যাইতাম।

কথিত আছে, তাহার চিৎকারের আওয়াজ ঘাড়ের চিৎকারের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। আবু সুফিয়ান যিনি এই যুদ্ধে কাফেরদের পক্ষে বড় শক্তিশালী ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন তিনি তাহাকে লজ্জা দিয়া বলিলেন, এই সামান্য একটু আঁচড়ে এমন চিৎকার করিতেছ। সে বলিল, তুমি কি জান, এই আঘাত কে করিয়াছেন? ইহা মুহাম্মদের আঘাত। এই আঘাতে আমার যে পরিমাণ কষ্ট হইতেছে—লাত ও উজ্জার (দুইটি প্রসিদ্ধ মূর্তির নাম) কসম করিয়া বলিতেছি, উহা যদি সমগ্র হিজাববাসীকে ভাগ করিয়া দেওয়া হয় তবে সকলেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। মুহাম্মদ যখন আমাকে কতল করিবার কথা বলিয়াছিল তখনই আমি বুঝিয়া নিয়াছিলাম

যে, অবশ্যই আমি তাহার হাতে নিহত হইব, রেহাই পাওয়ার আর কোন উপায় আমার নাই। আমাকে কতল করার কথা বলিবার পর তিনি যদি আমার উপর থুথুও নিক্ষেপ করিতেন তবু আমি মরিয়া যাইতাম। অবশেষে মক্কায় পৌঁছার একদিন পূর্বে পথিমধ্যেই সে মারা গেল।

উপরোক্ত ঘটনায় মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত লজ্জা ও শিক্ষার বিষয় এই যে, একজন পাক্কা কাফেরও ইসলামের ঘোরতর শত্রু হওয়া সত্ত্বেও হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী সত্য হওয়ার ব্যাপারে তাহার কি পরিমাণ দৃঢ় একীণ ও বিশ্বাস ছিল যে, তাহার হাতে নিহত হওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আমরা হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী বলিয়া স্বীকার করি, তাহাকে সত্যবাদী বলিয়া স্বীকার করি, তাঁহার বাণীসমূহকে অকাট্য সত্য মনে করি, তাহার সহিত মহব্বতের দাবী করি, তাঁহার উম্মত হওয়ার কারণে গর্ববোধ করি, এতদসত্ত্বেও তাঁহার কয়টি হাদীসের উপর আমল করিতেছি? যে সমস্ত বিষয়ে তিনি আজাবের হুঁশিয়ারী দিয়াছেন, সেই সব বিষয়ে আমরা কতটুকু ভীত-সন্ত্রস্ত হইতেছি। নিজের ভিতরে কি আছে তাহা প্রত্যেকেরই নিজের দেখার বিষয়। একের ব্যাপারে অন্য কি করিয়া বলিতে পারে।

ইবনে হজর (রহঃ) তাঁহার ‘যাওয়াজির’ কিতাবে ফেরআউন হামানের সাথে কারাগারের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, তাহাদের সহিত হাশর হওয়ার কারণ এই যে, ইহাদের মধ্যে যে সমস্ত দোষ পাওয়া যায়, সাধারণতঃ সেই সমস্ত দোষের কারণেই নামাযের মধ্যে অবহেলা করা হয়। সুতরাং নামাযে অবহেলা যদি ধন-সম্পদের কারণে হয়, তবে তাহার হাশর হইবে কারাগারের সহিত। আর যদি লজ্জামত ও রাজত্বের কারণে হয়, তবে তাহার হাশর হইবে ফেরআউনের সহিত। আর যদি মন্ত্রিত্ব (অর্থাৎ চাকরী বা মোসাহিবী)এর কারণে হয়, তবে তাহার হাশর হইবে হামানের সহিত। আর যদি ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে হয়, তবে তাহার হাশর হইবে উবাই ইবনে খলফের সহিত। মোটকথা তাহাদের সহিত হাশর হওয়া যখন সাব্যস্ত হইল তখন বিভিন্ন আজাব সম্পর্কিত হাদীসগুলি সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতামত যাহাই হউক কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, জাহান্নামের আজাব কঠিন হইতে কঠিনতর। অবশ্য ইহাও সত্য যে, ঈমানের কারণে একদিন না একদিন জাহান্নাম হইতে নাজাত লাভ হইবে আর ঐ কাফেররা চিরকাল সেখানে থাকিবে। কিন্তু নাজাতের পূর্ব পর্যন্ত সময়টাও কি হাসি-তামাশার ব্যাপার! কে জানে কত হাজার বছর দীর্ঘ হইবে।

حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ وَ
الثَّانِيَةَ يُوقَدُ عَلَيْهِ الْقَبْرُ
ثَلَاثًا فَتَقْلَبُ عَلَى الْحَسْرِ
لِيلًا وَنَهَارًا وَالثَّالِثَةَ
يَسْكُطُ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ
ثَعْبَانٌ رَأْسُهُ الشَّجَاعُ
الْأَقْرَعُ عَيْنَاهُ مِنْ نَارٍ
وَأَظْفَارُهُ مِنْ حَدِيدٍ طَوَّلُ
كُلِّ ظَعْمٍ مَسِيرَةُ يَوْمٍ
يَكْلَعُ اللَّيْتِ يَقُولُ أَنَا
الشَّجَاعُ الْأَقْرَعُ وَصَوْتُهُ
مِثْلُ الرَّعْدِ انْقَاصُ يَقُولُ
أَمْرِي كَقِي أَنِ اضْرِبْكَ عَلَى
تَضْيِيعِ صَلَوةِ الصُّبْحِ إِلَى بَعْدِ
طُلُوعِ الشَّمْسِ وَاضْرِبْكَ عَلَى
تَضْيِيعِ صَلَوةِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ
وَاضْرِبْكَ عَلَى تَضْيِيعِ صَلَوةِ
العَصْرِ إِلَى الْغَرْبِ وَاضْرِبْكَ
عَلَى تَضْيِيعِ صَلَوةِ الْغَرْبِ إِلَى
الْعِشَاءِ وَاضْرِبْكَ عَلَى تَضْيِيعِ
صَلَوةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ
فَكُلُّمَا مَرَّةً صَرَبَةً يَغْوَمُ
فِي الْأَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا
فَكَذَّيَالُ فِي الْقَبْرِ مُعَذَّبًا
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَمَّا الْبُخْرِي
فَيُصِيبُهُ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْقَبْرِ

پیس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر
سند بھی پی لے تو پیاس نہیں بھگتی۔ قبر کے
تین عذاب یہ ہیں اول اس پر براتی تنگ
ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسری میں
گھس جاتی ہیں۔ دوسرے قبر میں آگ
جلادی جاتی ہے تیسرے قبر میں ایک
سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے
جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور انہیں
لوہے کے اتنے لائے کہ ایک دن پورا
چل کر اس کے ختم تک پہنچ جاتے
اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح
ہوتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے
رَب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے
صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے
آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں
اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے
عصر تک مارے جاؤں اور پھر عصر کی
نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک
اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک
اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک
مارے جاؤں جب وہ ایک دفعہ
اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے
وہ مردہ ستر ہاتھ زمین میں دھس
جاتا ہے اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب
ہوتا رہیگا اور قبر سے نکلنے کے بعد کے تین
عذاب یہ ہیں ایک صاحب سختی سے کیا جاتا

٤ قَالَ بَعْضُهُمْ وَرَكَدَ فِي الْحَدِيثِ
أَنَّ مَنْ حَافِظَ عَلَى الصَّلَاةِ أَكْرَمَهُ
اللَّهُ تَعَالَى بِخَيْرِ خِصَالٍ يُرْفَعُ عَنْهُ
ضَيِّقُ الْعَيْشِ وَعَذَابُ الْقَبْرِ وَ
يُعْطِيهِ اللَّهُ كِتَابَةً بِحَمِيدِهِ وَ
يُسَرِّعُ لَهُ الصِّرَاطَ كَالْبَرْقِ وَ
يَكْمُلُ لَهُ الْجَنَّةُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَ مَنْ
تَهَاوَنَ عَنِ الصَّلَاةِ عَاقَبَهُ اللَّهُ
بِخَمْسِ عَشْرَةَ عَقُوبَةً خَمْسَةً
فِي الدُّنْيَا وَثَلَاثَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَ
ثَلَاثًا فِي قَبْرِهِ وَثَلَاثًا عِنْدَ
خُرُوجِهِ مِنَ الْقَبْرِ فَأَمَّا الْكُوفِيُّ
فِي الدُّنْيَا فَالْأَوَّلَى تُنْجِعُ الْبَرَكَةَ
مِنْ عَمَلِهِ وَالثَّانِيَةَ تُنْجِي سَيِّمَاءَ
الصَّالِحِينَ مِنْ وَجْهِهِ وَالثَّالِثَةَ
كُلُّ عَمَلٍ يَسْأَلُهُ لَا يَأْتِيهِ اللَّهُ
عَلَيْهِ وَالْآخِرَةُ لَا يُرْفَعُ لَهُ دُعَاءُ
إِلَى السَّمَاءِ وَالْخَامِسَةُ لَكِنَّ لَهَا
خَوْفٌ دُعَاءُ الصَّالِحِينَ وَأَمَّا الْبُخْرِي
فَيُصِيبُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ يَمُوتُ
ذَلِيلًا وَالثَّانِيَةَ يَمُوتُ جُوعًا وَ
الثَّالِثَةَ يَمُوتُ عَطْشًا وَكَوْشِي
يَحَارُ الدُّنْيَا مَا رَدِيَ مِنْ عَطْشِهِ
وَأَمَّا الْبُخْرِي فَيُصِيبُهُ فِي قَبْرِهِ
فَالْأَوَّلَى يَضِيقُ عَلَيْهِ الْقَبْرُ

ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اتنا
کڑا ہے حق تعالیٰ شاذ پانچ طرح سے اس کا
اکرام و اعزاز فرماتے ہیں ایک یہ کہ اس پر
رزق کی تنگی نہ ہو جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ
اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے۔ تیسرے
یہ کہ قیامت کو اس کے اعمال نائے دایں ہاتھ
میں دیے جائیں گے۔ جن کا حال سورۃ الحافہ
میں مفصل مذکور ہے کہ جن لوگوں کے نام نہ لکھ
دائے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ نہایت
خوش و خرم ہوں گے کہ کھاتے پھریں گے
اور چوتھے یہ کہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گذر
جائیں گے پانچویں بغیر حساب جنت میں
داخل ہوں گے اور جو شخص نماز میں تنگی کرتا ہے
اس کو پندرہ طریقہ سے عذاب ہوتا ہے
پانچ طرح دنیا میں اور تین طرح سے موت کے
وقت اور تین طرح قبر میں اور تین طرح قبر سے
نکلنے کے بعد۔ دنیا کے پانچ تو یہ ہیں اول یہ
کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی دوسرے
یہ کہ صلحاء کا نور اس کے چہرہ سے ہٹا دیا جاتا
ہے تیسرے یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا
دیا جاتا ہے چوتھے اس کی دعائیں قبول نہیں
ہوتیں پانچویں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں
میں اس کا اشتقاق نہیں رہتا اور موت کے
وقت کے تین عذاب یہ ہیں کہ اول ذلت
سے مرنا ہے دوسرے بھوکا مرنا ہے تیسرے

فِي مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ فَشَدَّةُ الْمَسَاءِ
وَسَخَطُ الرَّبِّ وَدُخُولُ النَّارِ وَفِي
رَوَايَةٍ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَعَلَى وَجْهِهِ ثَلَاثَةُ أَسْطُورٍ
مَجْكُورَاتٍ السَّطْرُ الْأَوَّلُ يَأْمُرُ
حَقُّ اللَّهِ السَّطْرُ الثَّانِي يَنْصَحُ
بِعَقَابِ اللَّهِ التَّالِثُ كَمَا صَبَّغَتْ
فِي الدُّنْيَا حَقُّ اللَّهِ فَأَيُّ الْيَوْمِ
أَنْتَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ.

গাওসের হক তৈয়্যি শাহ্‌রাস্তা
হুগা তিসের জহ্নম মিন দাখল করিয়া
ইকল মিরান জুদে হুতী মকন হে কে পুস্তে হুওয়াল
বহুল সে রাগিয়া হুওরা ইকল ওয়াইত মিন ই
বহী হে ক'স কে চেহে রে তিন সطر মিন
হুতী হুতী মিন পেলী সطر ও শের কে হক কুওয়াল
করনে ওলে দুসরী সطر ও শের কে
সাত্তে মখসুস তিসেরী সطر জিয়া করনে দিয়া
মিন শের কে হক কুওয়াল কিদা জ'আজ তুও শের
সে মালুস হে.

روما ذكر في هذا الحديث من تفصيل العدد لا يطابق جملة الخمس عشرة لأن المفضل
أربع عشرة فقط فلعلم الراوى نسي الخامس عشر كذا في الزواجر لابن حجر المكي قلت وهو
كذلك فان ابنا الليث السرقندي ذكر الحديث في قرة العيون فجعل ستة في الدنيا
فقال الخامسة تمته الخلائق في الدار الدنيا والسادس ليس له حظ في دعاء الصالحين
ثم ذكر الحديث بتمامه ولعريضة الى احد وفي تنبيه الغافلين للشيخ نصر بن محمد
ابن ابراهيم السرقندي يقال من داوم على الصلوة الخمس في الجماعة اعطاه
الله خمس خصال ومن تهاون بها في الجماعة عاقبه الله باثني عشر خصلة ثلاثة
في الدنيا وثلاثة عند الموت وثلاثة في القبر وثلاثة يوم القيامة ثم ذكر نحوها
ثم قال وروى عن ابى ذر عن النبى صلى الله عليه وسلم نحو هذا وذكر السيوطى
في ذيل اللؤلؤ بعد ما اخرج بمعناه من تغريغ ابن النجار في تاريخ بغداد بسنده
الى ابى هشيرة قال في الميزان هذا حديث باطل ركبته محمد بن على بن عباس على
ابى بكر بن زياد النيسابورى قلت لكن ذكر الحافظ في المنهاج عن ابى هشيرة
مرفوعا الصلوة عماد الدين وفيها عشر خصال الحديث ذكرته في الهندية وذكر
الغزالي في دقائق الاخبار بنحو هذا اتم منه وقال من حافظ عليها اكرم الله

بخمس عشرة (الخ مفصلاً)

⑨ এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি নামাযের এহতেমাম
করে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে পাঁচ প্রকারে সম্মানিত করেন। প্রথমতঃ

তাহার উপর হইতে রুজি-রোজগারের অভাব দূর করিয়া দেওয়া হয়।
দ্বিতীয়তঃ তাহার উপর হইতে কবরের আজাব হটাইয়া দেওয়া হয়।
তৃতীয়তঃ কিয়ামতের দিন তাহার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হইবে।
(যাহাদের অবস্থা সূরায়ে আল-হাক্কাতে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে
যে, যাহাদের ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হইবে তাহারা খুবই আনন্দ ও
খুশির সহিত প্রত্যেককে দেখাইতে থাকিবে) চতুর্থতঃ সে ব্যক্তি
পুলসিরাতের উপর দিয়া বিদ্যুতের মত পার হইয়া যাইবে। পঞ্চমতঃ বিনা
হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করিবে।

আর যে ব্যক্তি নামাযের ব্যাপারে অলসতা করে তাহাকে পনের
প্রকারের শাস্তি দেওয়া হয়। তন্মধ্যে পাঁচ প্রকার দুনিয়াতে, তিন প্রকার
মৃত্যুর সময়, তিন প্রকার কবরে, আর তিন প্রকার কবর হইতে বাহির
হওয়ার পর। দুনিয়াতে পাঁচ প্রকার এই—এক : তাহার জীবনে কোন
বরকত থাকে না। দ্বিতীয় : তাহার চেহারা হইতে নেককারদের নূর দূর
করিয়া দেওয়া হয়। তৃতীয় : তাহার নেক কাজসমূহের কোন বদলা দেওয়া
হয় না। চতুর্থ : তাহার কোন দোয়া কবুল হয় না। পঞ্চম : নেক বান্দাদের
দোয়ার মধ্যেও তাহার কোন হক থাকে না।

মৃত্যুর সময় তিন প্রকার শাস্তি এই—এক : জিল্লতির সহিত মৃত্যুবরণ
করে। দ্বিতীয় : ক্ষুধার্ত অবস্থায় তাহার মৃত্যুবরণ করে। তৃতীয় : এমন
কঠিন পিপাসার অবস্থায় মারা যায় যে, সমুদ্র পরিমাণ পানি পান
করিলেও তাহার পিপাসা মিটে না।

কবরের তিন প্রকার শাস্তি এই—এক : কবর তাহার জন্য এমন
সংকীর্ণ হইয়া যায় যে, বুকের একদিকের হাড়গুলি অপর দিকে ঢুকিয়া
যায়। দ্বিতীয় : তাহার কবরে আগুন জ্বলাইয়া দেওয়া হয়। তৃতীয় :
কবরে তাহার উপর এমন আকৃতির একটি সাপ নিযুক্ত হয় যাহার
চক্ষুগুলি আগুনের এবং নখগুলি লোহার হইবে। এত দীর্ঘ হইবে যে, পুরা
একদিন চলিয়া উহার শেষ পর্যন্ত পৌছা যাইবে। উহার আওয়াজ বজ্রের
মত হইবে। সে বলিতে থাকিবে, আমাকে আমার রব তোর উপর নিযুক্ত
করিয়াছেন, যেন ফজরের নামায নষ্ট করার কারণে সূর্যোদয় পর্যন্ত তোকে
দংশন করিতে থাকি, যোহরের নামায নষ্ট করার কারণে আছর পর্যন্ত
দংশন করিতে থাকি, পুনরায় আছরের নামায নষ্ট করার কারণে সূর্যাস্ত
পর্যন্ত, মাগরিবের নামায নষ্ট করার কারণে এশা পর্যন্ত এবং এশার নামায
নষ্ট করার কারণে সকাল পর্যন্ত দংশন করতে থাকি। এই সাপ যখন
তাহাকে একবার দংশন করে তখন উহার কারণে মূর্দা সত্তর হাত মাটির

নীচে ঢুকিয়া যায়। এইভাবে কিয়ামত পর্যন্ত তাহার আজাব হইতে থাকিবে।

কবর হইতে বাহির হওয়ার পর তিন প্রকার আজাব এই—এক : তাহার হিসাব কঠিনভাবে লওয়া হইবে। দ্বিতীয় : আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর রাগান্বিত থাকিবেন। তৃতীয় : তাহাকে জাহান্নামে দাখিল করিয়া দেওয়া হইবে।

এই পর্যন্ত সর্বমোট চৌদ্দটি হইয়াছে। সম্ভবতঃ পনের নম্বরটি ভুলবশতঃ রহিয়া গিয়াছে। অন্য এক রেওয়াযাতে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহার মুখমণ্ডলে তিনটি লাইন লেখা থাকিবে। প্রথম লাইন : ওহে আল্লাহর হক নষ্টকারী। দ্বিতীয় লাইন : ওহে আল্লাহর গোস্য পতিত। তৃতীয় লাইন : দুনিয়াতে তুই যে রূপ আল্লাহর হক নষ্ট করিয়াছিস আজ তুই আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইয়া যা।

(যাওয়াজির ইবনে হজর মকী (রহঃ))

ফায়দা : এই হাদীসের সম্পূর্ণটি যদিও আমি সাধারণ হাদীস গ্রন্থসমূহে পাই নাই। কিন্তু ইহাতে যত প্রকার সওয়াব ও আযাবের কথা বর্ণিত হইয়াছে উহার অধিকাংশেরই সমর্থন বিভিন্ন হাদীসের রেওয়াযাতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কিছু রেওয়াযাত পূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে আর কিছু পরে আসিতেছে। পূর্বে উল্লেখিত রেওয়াযাতসমূহে বে-নামাযী ইসলাম হইতে বাহির হইয়া যায় বলা হইয়াছে। এমতাবস্থায় আজাব যতই হইবে উহাকে কমই বলিতে হইবে। অবশ্য ইহা সত্য যে, এই হাদীসে যাহা কিছু উল্লেখিত হইয়াছে এবং পরে যাহা কিছু আসিতেছে সবই নামায ত্যাগ করার শাস্তি। আর এই শাস্তিযোগ্য অপরাধের পাশাপাশি আল্লাহ তায়ালা এই ঘোষণাও রহিয়াছে—

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা শিরকের গোনাহ মাফ করিবেন না। ইহা ছাড়া অন্য গোনাহের ব্যাপারে যাহাকে ইচ্ছা হইবে মাফ করিয়া দিবেন। (সূরা নিসা, আয়াত : ৪৮)

অতএব এই আয়াত এবং অনুরূপ অন্যান্য আয়াত ও বিভিন্ন হাদীসের ভিত্তিতে যদি এইরূপ অপরাধীকে আল্লাহ তায়ালা মাফ করিয়া দেন, তবে উহা অশেষ সৌভাগ্যের বিষয়। বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, কিয়ামতের দিন তিনটি আদালত বসিবে। একটি কুফর ও ইসলামের আদালত—এই আদালতে ক্ষমার কোন প্রশ্নই নাই। দ্বিতীয় হুকুকুল এবাদ

অর্থাৎ বান্দার হকের আদালত—এই আদালতে হকদারদের হক অবশ্যই আদায় করিয়া দেওয়া হইবে—যাহার নিকট পাওনা রহিয়াছে তাহার নিকট হইতে লইয়া দেওয়া হইবে অথবা দেনাদারকে যদি আল্লাহ মাফ করিতে চাহেন, তবে তিনি নিজেই পাওনাদারের হক আদায় করিয়া দিবেন। তৃতীয় হুকুকুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর হকের আদালত—এই আদালতে আল্লাহ পাক নিজের বখশিশ ও ক্ষমার দরজা খুলিয়া দিবেন।

এইসব রেওয়াযাত ও বর্ণনার কারণে এই কথা অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে, আপন কৃতকর্মের শাস্তি তো উহাই যাহা হাদীসসমূহে বর্ণিত হইয়াছে। তবে রাহমান রাহীমের দয়া ও মেহেরবানী এই সবকিছুর উর্ধ্বে। উপরে যেইসব আজাব ও সওয়াবের কথা বর্ণিত হইয়াছে উহা ছাড়া অন্যান্য হাদীসে আরও বিভিন্ন প্রকার আজাব ও সওয়াবের কথা আসিয়াছে। বুখারী শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আসিয়াছে, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল, তিনি ফজরের নামাযের পর সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করিতেন যে, কেহ কোন স্বপ্ন দেখিয়াছে কিনা। যদি কেহ দেখিত তবে বর্ণনা করিত। আর হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহার তাবীর বা ব্যাখ্যা বলিয়া দিতেন।

একবার হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভ্যাস মত জিজ্ঞাসা করিলেন অতঃপর ফরমাইলেন যে, আমি একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, দুইজন লোক আসিয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। অতঃপর দীর্ঘ স্বপ্ন বর্ণনা করিলেন। ইহাতে তিনি বেহেশত, দোযখ এবং দোযখের মধ্যে লোকদের বিভিন্ন প্রকার আজাব হইতে দেখিয়াছেন। তন্মধ্যে এক ব্যক্তিকে দেখিয়াছেন যে, তাহার মাথা পাথর দ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইতেছে এবং এতো জোরে পাথর মারা হইতেছে যে, সেই পাথর ছিটকাইয়া দূরে গিয়া পড়ে। পাথরটিকে উঠাইয়া আনিতে আনিতে তাহার মাথা আগের মতই হইয়া যায়। আবার তাহার মাথায় সজোরে আঘাত করা হয়। এইরূপ আচরণ তাহার সহিত বারবার করা হইতেছে। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সঙ্গীদ্বয়ের নিকট জানিতে চাহিলেন যে, এই লোকটি কে? তখন তাহারা বলিল, এই ব্যক্তি কুরআন শরীফ পড়িয়া উহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিল এবং ফরজ নামায না পড়িয়া ঘুমাইয়া যাইত।

অন্য এক হাদীসে একই ধরনের ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে যে, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোকের সাথে এইরূপ আচরণ করা হইতেছে দেখিয়া হযরত জিবরাঈল (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তরে বলিলেন, এইসব লোক নামাযে অবহেলা করিত। (তারগীব)

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, যে সমস্ত লোক নামাযের ওয়াজের ব্যাপারে সচেতন থাকে, তাহাদের মধ্যে এমন বরকত হয় যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর আওলাদগণের মধ্যে হইয়াছে। (দুররে মানসূর)

হযরত আনাস (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করেন, যে ব্যক্তি এখলাসের সহিত ঈমান রাখে, তাঁহার (আল্লাহ তায়ালা) এবাদত করে, নামায পড়ে, যাকাত আদায় করে, আর এমতাবস্থায় দুনিয়া হইতে বিদায় হয় আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন। (দুররে মানসূর)

হযরত আনাস (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে আল্লাহ তায়ালা এই এরশাদ নকল করেন যে, আমি কোন এলাকায় আজাব নাযিল করার ইচ্ছা করি কিন্তু সেখানে এমন লোকদেরকে দেখিতে পাই, যাহারা মসজিদসমূহকে আবাদ করে, আল্লাহর ওয়াস্তে একে অপরকে মহব্বত করে, শেষ রাত্রে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায়, তখন আমি আজাব স্থগিত করিয়া দেই। (দুররে মানসূর)

হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হযরত সালমান ফারেসী (রাযিঃ) এর নামে এক চিঠিতে লিখিয়াছেন, অধিকাংশ সময় মসজিদে অতিবাহিত কর। আমি হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি যে, মসজিদ মোস্তাকী লোকদের ঘর এবং আল্লাহ পাক এই কথার ওয়াদা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি অধিকাংশ সময় মসজিদে কাটাইবে তাহার উপর রহমত নাযিল করিব, তাহাকে শান্তি দান করিব, কিয়ামতের দিন পুলসিরাতের রাস্তা আছান করিয়া দিব এবং আমার সন্তুষ্টি নসীব করিব।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করেন যে, মসজিদসমূহ আল্লাহ পাকের ঘর, আর যাহারা ঘরে আসে তাহাদের সম্মান ও একরাম হইয়াই থাকে ; অতএব আল্লাহর উপর ঐসব লোকের সম্মান করা জরুরী যাহারা মসজিদে হাযির হয়।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করেন যে, যাহারা মসজিদের সহিত মহব্বত রাখে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের সহিত মহব্বত রাখেন।

হযরত আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করেন, যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয়, তখন যাহারা কবর পর্যন্ত সাথে গিয়াছিল তাহারা ফিরিবার পূর্বেই ফেরেশতাগণ পরীক্ষা লওয়ার জন্য হাজির হইয়া যান। মৃত ব্যক্তি মুমিন হইয়া থাকিলে নামায

তাহার মাথার নিকটে থাকে, যাকাত তাহার ডান দিকে, রোযা তাহার বাম দিকে এবং অন্যান্য নেক আমল তাহার পায়ের দিকে থাকে, এইভাবে চতুর্দিক হইতে তাহাকে ঘিরিয়া লয়। কেহ তাহার নিকটবর্তী হইতে পারে না। ফলে ফেরেশতাগণ দূর হইতেই দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করেন। (দুররে মানসূর)

এক সাহাবী (রাযিঃ) বলেন, যখন হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে কোন অভাব দেখা দিত, তখন তিনি পরিবার-পরিজনকে নামাযের হুকুম করিতেন এবং এই আয়াত তেলাওয়াত করিতেন :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا لَّخَنُ نَزَقْنَاكَ
وَالْعَاقِبَةُ لِلشَّقَوِيِّ

অর্থাৎ আপনার পরিবার-পরিজনকে নামাযের হুকুম করুন এবং নিজেও নামাযের এহতেমাম করিতে থাকুন। আপনি রুজি উপার্জন করুন—ইহা আমি চাই না ; রুজি তো আমিই দিব। আর উত্তম পরিণতি পরহেজগারীর মধ্যেই রহিয়াছে। (সূরা ত্বহা, আয়াত : ১৩২)

হযরত আসমা (রাযিঃ) বলেন, আমি হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, কিয়ামতের দিন সকল মানুষ এক জায়গায় জমা হইবে এবং ফেরেশতাগণ যে কোন আওয়াজই দিবেন সকলেই তাহা শুনিতে পাইবে। ঐ সময় ঘোষণা করা হইবে, কোথায় ঐ সকল লোক যাহারা সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা প্রশংসা করিত। ইহা শুনিয়া একদল উঠিবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আবার ঘোষণা করা হইবে, কোথায় ঐ সমস্ত লোক যাহারা রাত্র জাগিয়া আরামের বিছানা ত্যাগ করিয়া এবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকিত। তৎপরে এক জামাত উঠিবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। আবার ঘোষণা করা হইবে, কোথায় ঐ সমস্ত লোক যাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচা-কেনা আল্লাহর স্মরণ হইতে গাফেল করিত না। তৎপরে এক জামাত উঠিবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

অন্য এক হাদীসে এই ঘটনার সহিত ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, তখন ঘোষণা করা হইবে, আজ হাশরবাসী দেখিতে পাইবে যে, সম্মানিত লোক যাহারা? আরও ঘোষণা করা হইবে, কোথায় ঐ সমস্ত লোক যাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যস্ততা আল্লাহর যিকির ও নামায হইতে বাধা দিত না।

(দুররে মানসূর)

এই হাদীসটি শায়খ নসর সমরকন্দী (রহঃ) ‘তাস্বীহুল গাফেলীন’

নামক কিতাবেও লিখিয়াছেন। অতঃপর লিখিয়াছেন যে, যখন এই সকল লোক বিনা হিসাবে মুক্তি পাইয়া যাইবে তখন জাহান্নাম হইতে একটি লম্বা গর্দান বাহির হইয়া আসিবে এবং উহা লোকদিগকে ডিঙ্গাইয়া চলিয়া আসিবে। উহার দুইটি উজ্জ্বল চক্ষু থাকিবে এবং তাহার ভাষা খুবই স্পষ্ট হইবে। সে বলিবে, আমি ঐসব লোকদের উপর নিযুক্ত হইয়াছি, যাহারা অহংকারী ও বদমেজাজী এবং সমবেত লোকদের মধ্য হইতে তাহাদেরকে এমনভাবে বাছিয়া লইবে, যেভাবে পশুপক্ষী উহাদের খাদ্য বাছিয়া লয়। তাহাদিগকে বাছিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবে। অতঃপর এইরূপে দ্বিতীয় বার বাহির হইয়া বলিবে যে, এইবার আমি ঐ সমস্ত লোকদের উপর নিযুক্ত হইয়াছি যাহারা আল্লাহ ও তাহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিয়াছে। তাহাদিগকেও দল হইতে বাছিয়া লইয়া যাইবে। অতঃপর তৃতীয়বার বাহির হইয়া আসিবে এবং এইবার ছবি অংকনকারীদিগকে বাছিয়া লইয়া যাইবে। এই তিন প্রকার লোক ময়দান হইতে পৃথক হইয়া যাওয়ার পর হিসাব নিকাশ শুরু হইবে।

কথিত আছে, আগেকার যুগে মানুষ শয়তানকে দেখিতে পাইত। এক ব্যক্তি শয়তানকে বলিল, তুমি আমাকে এমন কোন পস্থা শিখাইয়া দাও, যাহা করিলে আমিও তোমার মত হইতে পারি। শয়তান বলিল, এমন আবদার তো আজ পর্যন্ত আমার নিকট কেহ করে নাই, তোমার কি প্রয়োজন দেখা দিল? লোকটি বলিল, আমার মন এরূপ চাহিতেছে। শয়তান বলিল, ইহার পস্থা এই যে, নামাযে অবহেলা করিও এবং সত্য-মিথ্যা কসম খাইয়া কথা বলিতে কোনই পরওয়া করিও না। লোকটি বলিয়া উঠিল, আমি আল্লাহর সঙ্গে ওয়াদা করিতেছি যে, জীবনে কখনও নামায ছাড়িব না এবং কসমও খাইব না। ইহা শুনিয়া শয়তান বলিল, আজ পর্যন্ত চালবাজি করিয়া তুমি ছাড়া আর কেহ আমার নিকট হইতে কথা নিতে পারে নাই। আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, মানুষকে কখনও উপদেশ দিব না।

হযরত উবাই (রাযিঃ) বলেন, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, এই উম্মতকে উচ্চ মর্যাদা, ইজ্জত-সম্মান ও দ্বীনের উন্নতির সুসংবাদ দান কর। তবে যে ব্যক্তি দ্বীনের কোন কাজ দুনিয়ার উদ্দেশ্যে করিবে আখেরাতে তাহার কোন অংশ নাই। (তরগীব)

এক হাদীসে আসিয়াছে, হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, আমি সর্বোত্তম অবস্থায় আল্লাহ তায়ালার যিয়ারত লাভ করিয়াছি। আমার প্রতি এরশাদ হইয়াছে যে, হে মুহাম্মদ! মালায়ে

আলা অর্থাৎ ফেরেশতারা কোন বিষয় লইয়া পরস্পর মতভেদ করিতেছে? আমি আরজ করিলাম, আমার তো জানা নাই। তখন আল্লাহ পাক আপন কুদরতী হাত আমার বুকের উপর রাখিয়া দিলেন। যাহার শীতলতা আমার বুকের ভিতর পর্যন্ত অনুভব করিলাম। ইহার বরকতে সমগ্র সৃষ্টিজগত আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া গেল। আমাকে আবার প্রশ্ন করা হইল, এখন বলুন, ফেরেশতারা কোন বিষয়ে পরস্পর মতভেদ করিতেছে? আমি আরজ করিলাম, যে সব জিনিস মানুষের মর্যাদা বুলন্দ করে এবং যে সব জিনিস মানুষের গোনাহের কাফ্যারা হয় আর জামাতে নামায পড়ার জন্য যে কদম উঠে, উহার সওয়াব সম্পর্কে, শীতের সময় উত্তমরূপে ওয়ূ করার ফযীলত এবং এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় বসিয়া থাকার ফযীলত সম্পর্কে। যে ব্যক্তি এইসব জিনিসের এহতেমাম করিবে, উত্তম হালতে জিন্দেগী কাটাইবে এবং উত্তম হালতে তাহার মৃত্যু হইবে।

বিভিন্ন হাদীসে আসিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ হে আদমসন্তান! তুমি দিনের শুরুতে আমার জন্য চার রাকআত নামায পড়িয়া লও, তোমার সারাদিনের যাবতীয় কাজ আমি সমাধা করিয়া দিব।

‘তাস্বীহুল-গাফেলীন’ কিতাবে একটি হাদীস বর্ণিত আছে যে, নামায আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ, ফেরেশতাদের প্রিয় বস্তু, আশ্বিয়ায়ে কেরামের আদর্শ। ইহা দ্বারা মারেফাতের নূর পয়দা হয়, দোয়া কবুল হয়, রিষিকে বরকত হয়। ইহা ঈমানের মূল, শরীরের আরাম, দুশমনের বিরুদ্ধে অস্ত্র, নামাযীর জন্য সুপারিশকারী, কবরের চেরাগ ও উহার নির্জনতায় মনোরঞ্জনকারী, মুনকার-নকীরের প্রশ্নের উত্তর, কেয়ামতের প্রচণ্ড রৌদ্রে ছায়া, অন্ধকারে আলো, জাহান্নামের আগুনের প্রতিবন্ধক, আমলের পাল্লার ওজন, দ্রুত পুলসেরাত পার করিয়া দেয়, জান্নাতের চাবি।

হাফেজ ইবনে হজর (রহঃ) ‘মুনাব্বিহাত’ কিতাবে হযরত উসমান গনী (রাযিঃ) হইতে নকল করিয়াছেন, যে ব্যক্তি পাবন্দি সহকারে সঠিক সময়ে নামাযের এহতেমাম করে, আল্লাহ তায়ালা নয়টি পুরস্কারের দ্বারা তাহাকে সম্মানিত করেন। (১) আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং তাহাকে ভালবাসেন। (২) তাহাকে সুস্থতা দান করেন। (৩) ফেরেশতাগণ তাহার হেফাজত করেন। (৪) তাহার ঘরে বরকত দান করেন। (৫) তাহার চেহারা বুয়ুর্গদের নূর ফুটিয়া উঠে। (৬) তাহার দিল নরম করিয়া দেন। (৭) পুলসিরাতের উপর দিয়া সে বিজলীর মত দ্রুত পার হইয়া যাইবে।

(৮) তাহাকে জাহান্নাম হইতে নাজাত দিয়া দেন। (৯) জান্নাতে এমন লোকদের প্রতিবেশী হিসাবে সে স্থান পাইবে, যাহাদের সম্পর্কে কুরআনে এই সুসংবাদ আসিয়াছে : لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ অর্থাৎ কেয়ামতের দিন না তাহাদের কোন ভয়ভীতি থাকিবে আর না তাহাদের কোন প্রকার চিন্তা থাকিবে। (সূরা বাকারাহ, আয়াত : ৬২)

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, নামায দ্বীনের খুঁটি এবং ইহার মধ্যে দশ প্রকার উপকারিতা রহিয়াছে : (১) নামায চেহারার উজ্জ্বলতা (২) দিলের নূর (৩) শরীরের আরাম ও সুস্বাস্থ্যের কারণ (৪) কবরের সঙ্গী (৫) আল্লাহর রহমত নাযিলের ওসীলা (৬) আসমানের চাবি (৭) নেক আমলের পাল্লা ভারী হওয়ার বস্তু (উহা দ্বারা নেক আমলের পাল্লা ভারী হইয়া যায়) (৮) আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ (৯) বেহেশতের মূল্য (১০) দোযখের প্রতিবন্ধক। যে ব্যক্তি নামায কয়েম করিল সে দ্বীনকে কয়েম রাখিল আর যে নামায ত্যাগ করিল সে নিজের দ্বীনকে ধ্বংস করিল। (মুনাব্বিহাতে ইবনে হজর)

এক হাদীস বর্ণিত আছে, ঘরে নামায পড়া নূর স্বরূপ, সুতরাং তোমরা (নফল) নামায পড়িয়া নিজেদের ঘরগুলিকে উজ্জ্বল কর। (জামে সগীর) আর এই হাদীস তো খুবই প্রসিদ্ধ যে, আমার উম্মত কিয়ামতের দিন ওয়ু ও সেজদার দরুন উজ্জ্বল হাত পা এবং উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী হইবে এবং এই আলামত দ্বারাই তাহাদিগকে অন্যান্য উম্মত হইতে চিনা যাইবে।

এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যখন আসমান হইতে কোন বাল্লা-মুসীবত নাযিল হয় তখন মসজিদ আবাদকারীদের হইতে উহা সরাইয়া লওয়া হয়। (জামে সগীর) বিভিন্ন হাদীসে আসিয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা সিজদার নিশানীকে জাহান্নামের উপর হারাম করিয়া দিয়াছেন, সে উহা জ্বলাইতে পারিবে না। (অর্থাৎ নিজের বদ-আমলীর কারণে যদি সে জাহান্নামে প্রবেশ করেও, তবু যে জায়গায় সিজদার চিহ্ন থাকিবে সেই জায়গায় আগুন কোন আছর করিতে পারিবে না।)

এক হাদীসে আছে যে, নামায শয়তানের মুখ কালো করিয়া দেয় এবং দান-খয়রাত শয়তানের কোমর ভাঙ্গিয়া দেয়। (জামে সগীর) এক রেওয়াযাতে এরশাদ হইয়াছে যে, নামায (রোগের জন্য) শেফা।

(জামে সগীর)

অন্য এক রেওয়াযাতে এই সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে যে, হযরত আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) একবার পেটের উপর ভর করিয়া

শুইয়া ছিলেন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পেটে কি ব্যথা হইতেছে? হযরত আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) আরজ করিলেন, জ্বি হাঁ। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, উঠ, নামায পড়। নামাযের মধ্যে শেফা রহিয়াছে।

(ইবনে কাসীর)

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার স্বপ্নযোগে বেহেশত দেখিলেন। সেখানে তিনি হযরত বেলাল (রাযিঃ) এর জুতা ঘষিয়া চলার আওয়াজও শুনিতে পাইলেন। সকাল বেলা হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল (রাযিঃ) কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সেই বিশেষ আমল কি, যাহার বদৌলতে জান্নাতেও তুমি (দুনিয়ার ন্যায়) আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিলে? তিনি আরজ করিলেন, দিবা-রাত্রি যখনই আমার ওয়ু নষ্ট হয় তখনই ওয়ু করিয়া লই এবং যে কয় রাকআত তৌফীক হয় তাহিয়াতুল ওয়ু নামায পড়িয়া লই। (ফাতহুল বারী) হযরত সাফীরী (রহঃ) বলিয়াছেন, ফজরের নামায ত্যাগকারীকে ফেরেশতাগণ হে ফাজের (বদকার), যোহরের নামায ত্যাগকারীকে হে খাছের (ক্ষতিগ্রস্ত), আছরের নামায ত্যাগকারীকে হে আছী (না-ফরমান), মাগরিবের নামায ত্যাগকারীকে হে কাফের এবং এশার নামায ত্যাগকারীকে হে মুজীহ (আল্লাহর হক বিনষ্টকারী) বলিয়া ডাকিয়া থাকেন। (গালিয়াতুল-মাওয়াযেজ)

আল্লামা শারানী (রহঃ) বলেন, এই কথা বুঝিয়া লওয়া উচিত যে, বাল্লা-মুসীবত এমন সব বসতি হইতে হটাইয়া দেওয়া হয় যেখানকার লোকজন নামাযী। পক্ষান্তরে যে সকল বসতির লোক নামাযী নহে সেই সব স্থানে বাল্লা-মুসীবত নাযিল হয়। এইরূপ এলাকায় ভূমিকম্প বা বজ্রপাত হওয়া কিংবা বাড়ীঘর ধসিয়া পড়া মোটেই অসম্ভব নয়। কেহ যেন এই ধারণা না করে যে, 'আমি তো নামাযী, অন্যদের ব্যাপারে আমার কোন দায়িত্ব নাই।' বাল্লা-মুসীবত যখন নাযিল হয় তখন তাহা ব্যাপক হইয়া থাকে। স্বয়ং হাদীস শরীফে আসিয়াছে যে, কেহ জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের মধ্যে নেককার লোক মওজুদ থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হইতে পারি? হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, হাঁ যখন খারাবী অধিক হইয়া যায়। কেননা, সামর্থ্য অনুযায়ী সংকাজের আদেশ করা এবং অসং কাজ হইতে বিরত রাখা তাহাদের জন্যও জরুরী ছিল।

حُضُرُ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقَلَ كَيْفَ كَانَ
كَرْبُ مَنْ نَزَلَ فِي تَضَارُّعِهِ كَوَدَّ بَعْدَ مِثْلِهِ

۸ رَوَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
قَالَ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ حَتَّى مَضَى

وَقَدْ تَمَّ شَرْقُ قَضَى عَذَابٍ فِي النَّارِ
مُحِبًّا وَالْمُحِبُّ تَمَّا تَوْنُ سَكَنَةً
وَالسَّكَنَةُ تَلْتُمُ نَائِمَةً وَتَسْتَوِي يَوْمًا
كُلَّ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ
سَنَةٍ
بھی لے پھر بھی اپنے وقت پر پڑھنے کی وجہ
سے ایک حُجُبِ جہنم میں جلے گا اور حُجُبِ کی
مقدار اتنی برس کی ہوتی ہے اور ایک سے
تین سو ساٹھ دن کا اور قیامت کا ایک دن
ایک ہزار برس کے برابر ہوگا (اس حدیث سے)
ایک حُجُب کی مقدار دو کروڑ اٹھاسی لاکھ برس ہوتی (۲۸۸)

(كَذَا فِي مَجَالِسِ الْأَبْرَارِ قُلْتُ لِمَ اجْعَلُهُ فَيَا عِنْدِي مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ إِلَّا أَنْ
مَجَالِسِ الْأَبْرَارِ مَدَحُهُ شَيْخٌ مِثْلُنَا الشَّاهِدُ عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّهْلَوِيُّ ثُمَّ قَالَ الرَّابِعُ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَا بَشِينَ فِيهَا احْتِقَابًا قِيلَ جَمَعَ الْحَقْبُ أَيْ الدَّهْرَ قِيلَ وَالْحَقْبَةُ تَشَابُوهُ
عَالَمًا وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْحَقْبَةَ مَدَّةٌ مِنَ الزَّمَانِ مَبْهُمَةٌ وَخَرَجَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى
فَوَيْلٌ لِلْبَصَالِينِ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ فِي جَهَنَّمَ لَوَادِيَا
تَسْتَمِيزُ جَهَنَّمَ مِنْ ذَلِكَ الْوَادِي فِي كُلِّ يَوْمٍ أَرْبَعُمِائَةٍ مَرَّةً أَعْدَدَ ذَلِكَ الْوَادِي لِلرَّائِي
مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٌ الْحَدِيثُ وَذَكَرَ الْوَالِي السَّرِقَنْدِيُّ فِي قُرَّةِ الْعْيُونِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ
مُسْكَنٌ مَنْ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا وَعَنْ سَعْدِ بْنِ الْجَوْقَارِ عَنْ مَرْفُوعٍ أَنَّ الَّذِينَ هُمْ عَنْ
صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ قَالَ هُمُ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا وَصَحَّحَ الْحَاكِمُ وَابْنُ أَبِي
وَقْفَهُ وَخَرَجَ الْحَاكِمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيَاً قَالَ دَاوُدُ فِي جَهَنَّمَ لَيْدِ
الْقَرْخِ بِثِثِ الطَّعْمِ وَقَالَ صَحِيحُ الْأَسْنَدِ)

⑦ ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি নামায কাজা করে, যদিও পরে উহা পড়িয়া নেয়। তথাপি সময়মত নামায না পড়ার কারণে সে এক হোকবা পরিমাণ জাহান্নামে জ্বলিবে। আশি বৎসরে এক হোকবা হয়। আর এক বৎসর তিনশত ষাট দিনে আর কিয়ামতের একদিন এক হাজার বছরের সমান হইবে। এই হিসাবে এক হোকবার পরিমাণ হইল দুই কোটি অষ্টাশি লক্ষ বৎসর।

(মাজালিসুল-আবরার)

ফায়দা : আভিধানিক অর্থে হোকবা হইল দীর্ঘ মেয়াদী সময়। অধিকাংশ হাদীসে উহার পরিমাণ উল্লেখিত সংখ্যাই আসিয়াছে। দূররে মানছুর কিতাবেও বিভিন্ন রেওয়াযাতে ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আলী (রাযিঃ) বেলাল হাজরী (রহঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তিনি

বলিয়াছেন, আশি বৎসরে এক হোকবা। প্রতি বৎসরে বার মাস। প্রতি মাসে ত্রিশ দিন। আর প্রতিদিনে এক হাজার বৎসরের সমান।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হইতে সহীহ রেওয়াযাত মোতাবেক আশি বৎসর বর্ণিত হইয়াছে। হযরত আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) খোদ ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতেও ইহা নকল করিয়াছেন যে, আশি বৎসরে এক হোকবা, তিনশত ষাট দিনে এক বৎসর এবং একদিন তোমাদের এই জগতের হিসাবে এক হাজার দিনের সমান হয়। এই একই হিসাব হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) ও ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করিয়াছেন। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলিয়াছেন যে, কাহারও এই ভরসায় থাকা উচিত নয় যে, ঈমানের বদৌলতে শেষ পর্যন্ত জাহান্নাম হইতে বাহির হইবই। কারণ দুই কোটি অষ্টাশি লক্ষ বৎসর কোন সাধারণ কথা নয়; তাহাও যদি আরও অধিক পরিমাণ সময় দোষখে থাকার মত অন্য কোন অপরাধ না থাকে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন হাদীসে কিছু কমবেশী সময়েরও উল্লেখ আসিয়াছে। কিন্তু প্রথমতঃ উপরে লিখিত পরিমাণটির কথা কয়েকটি হাদীসে আসিয়াছে, এইজন্য ইহাই প্রাধান্য রাখে। দ্বিতীয়তঃ ইহাও সম্ভব যে, বিভিন্ন লোকের অবস্থার প্রেক্ষিতে কমবেশী হইতে পারে।

আবু লাইস সমরকন্দী (রহঃ) ‘কুররাতুল উয়ূন’ গ্রন্থে ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ নকল করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া এক ওয়াক্ত নামায ছাড়িয়া দেয় তাহার নাম জাহান্নামের দরজায় লিখিয়া দেওয়া হয় এবং তাহাকে উহাতে অবশ্যই প্রবেশ করিতে হইবে। আবু লাইস সমরকন্দী (রহঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে নকল করিয়াছেন যে, একবার ছযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন : তোমরা এই দোয়া কর হে আল্লাহ, আমাদের মধ্যে কাহাকেও তুমি হতভাগ্য বঞ্চিত করিও না। অতঃপর নিজেই প্রশ্ন করিলেন, তোমরা কি জান হতভাগ্য বঞ্চিত কে? সাহাবীগণ জানিতে চাহিলে তিনি এরশাদ করিলেন, যে ব্যক্তি নামায ছাড়িয়া দেয় সেই হতভাগ্য বঞ্চিত। ইসলামে তাহার কোন অংশ নাই।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া বিনা ওজরে নামায ত্যাগ করিবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তাহার দিকে দ্রষ্টিপাত করিবেন না এবং তাহাকে ‘আজাবুন আলীম’ অর্থাৎ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া হইবে। এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, দশ ব্যক্তি বিশেষভাবে শাস্তি ভোগ করিবে। তন্মধ্যে একজন হইল নামায ত্যাগকারী,

(اخرجه البزار واخرج الحاكم عن عائشة مرفوعاً وصححه ثلث احلف عليهن لا يعبد الله من له سهم في الاسلام كمن لا سهم له وسهام الاسلام الصوم والصلوة والصدقة الحديث واخرج الطبراني في الاوسط عن ابن عمر مرفوعاً لا دين لمن لا صلوة له انما موضع الصلوة من الدين كوضع الراس من الجسد كذا في الدر المنثور)

হযরত ওমর (রাঃ) শেষ সময়ে যখন বর্ষা দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হন, তখন সব সময়ই তাহার ক্ষতস্থান হইতে রক্ত জারী থাকিত এবং অধিকাংশ সময়ই তিনি একেবারে বেখবর অবস্থায় থাকিতেন, এমনকি এই অবস্থায় তাঁহার ওফাতও হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এই দিনগুলিতে যখন নামাযের সময় হইয়া যাইত তখন তাহাকে নামাযের কথা স্মরণ করাইয়া নামায পড়ার জন্য দরখাস্ত করা হইত। তিনি এই অবস্থাতেই নামায আদায় করিতেন এবং বলিতেন, হাঁ হাঁ, নিশ্চয়ই। যে ব্যক্তি নামায পড়ে না, ইসলামে তাহার কোন অংশ নাই। অথচ আমাদের নিকট অসুস্থ ব্যক্তির আরাম ও মঙ্গল কামনা ইহার মধ্যেই মনে করা হয় যে, তাহাকে নামাযের জন্য কষ্ট না দেওয়া উদ্ভক ; পরে ফিদিয়া দিয়া

দেওয়া যাইবে। বস্তুতঃ ঐসব মহান ব্যক্তিদের নিকট রোগীর প্রতি দরদ ইহাকেই মনে করা হইত যে, মওতের মুখেও যদি এবাদত করা সম্ভব হয় তবু উহাতে বাধা না দেওয়া হউক।

بين تفاوت راه از کجا است تا به کجا

দেখ, উভয় রাস্তার মাঝে কত ব্যবধান—কত পার্থক্য!

হযরত আলী (রাযিঃ) একবার হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া কাজকর্মে সাহায্যের জন্য একজন খাদেম চাহিলেন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, এই তিনজন গোলামের মধ্যে যাহাকে তোমার পছন্দ হয় লইয়া যাও। হযরত আলী (রাযিঃ) বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনিই পছন্দ করিয়া দিন। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজনকে দিয়া বলিলেন, ইহাকে লইয়া যাও, সে নামাযী। কিন্তু ইহাকে মারধর করিও না। কেননা, নামাযীকে মারধর করিতে আমাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছে।

অনুরূপ আরেকটি ঘটনা একজন সাহাবী হযরত আবুল হাইছাম (রাযিঃ)এর সাথেও ঘটিয়াছিল। তিনিও হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গোলামের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে বর্তমান যুগে আমাদের কাজের লোক বা কর্মচারী যদি নামাযী হয় তবে আমরা তাহাকে তিরস্কার করি এবং নিজের নির্বুদ্ধিতার দরুন তাহার নামাযের দ্বারা আমাদের কাজে ক্ষতি হইতেছে মনে করিয়া থাকি।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ)এর উপর একবার আধ্যাত্মিক বিশেষ অবস্থা প্রবল হইয়াছিল। এই ধ্যানমগ্ন অবস্থায় সাত দিন পর্যন্ত তিনি ঘরে ছিলেন, ঘুম ও খাওয়া-দাওয়া সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মুরশিদকে এই বিষয়ে জানানো হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, নামায ঠিকমত আদায় করিতেছে কি না? লোকেরা বলিল, জ্বি হাঁ, নামাযে ত্রুটি নাই। ইহাতে মুরশিদ বলিলেন, সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর যিনি শয়তানকে তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে দেন নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায় জামাতের বর্ণনা

কিতাবের শুরুতে লেখা হইয়াছে যে, এমন অনেক ব্যক্তি রহিয়াছেন, যাহারা নামায পড়িয়া থাকেন বটে কিন্তু জামাতে নামায পড়ার এহতেমাম করেন না। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে যেমন নামায পড়ার বিষয়ে কঠোরভাবে তাকীদ আসিয়াছে তেমনি জামাতের সহিত নামায পড়ার বিষয়েও অনেক তাকীদ বর্ণিত হইয়াছে।

এই অধ্যায়ে দুইটি পরিচ্ছেদ আছে। প্রথম পরিচ্ছেদ জামাতের ফযীলত সম্পর্কে এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ জামাত তরক করার শাস্তি সম্পর্কে।

প্রথম পরিচ্ছেদ জামাতের ফযীলত

① عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

مَنْ شَرَّكَ فِي صَلَاةٍ مَعَ النَّاسِ وَكَانَ يَتْلُو الْفَذَّ وَكَانَ يَتْلُو الْجَمَاعَةَ كَانَ لَهُ ثَلَاثُونَ دَرَجَةً

(رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي كذا في الترغيب)

① হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, জামাতের নামায একা নামায হইতে সাতাইশ গুণ বেশী মতবা রাখে।

(তারগীবঃ বুখারী, মুসলিম)

ফায়দাঃ মানুষ যখন নামায পড়ে এবং সওয়াবের নিয়তেই পড়িয়া থাকে, তখন ইহা একটি মামুলী ব্যাপার যে ঘরে না পড়িয়া মসজিদে যাইয়া জামাতের সহিত পড়িয়া লইবে, ইহাতে না তেমন কোন কষ্ট হয় আর না কোন অসুবিধা হয়। অথচ এত অধিক পরিমাণ সওয়াব লাভ হইয়া থাকে; কে আছে এমন যে, এক টাকার পরিবর্তে সাতাইশ বা আটাইশ টাকা পাইয়াও উহাকে ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে এত বড় লাভের প্রতিও ঞ্ক্ষেপ করা হয় না। ইহার কারণ এ ছাড়া আর কি হইতে পারে যে, দ্বীনের ব্যাপারে আমাদের কোন পরওয়া নাই। আমাদের দৃষ্টিতে দ্বীনের লাভ যেন কোন লাভই নয়। দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্যের

لَا يَزَالُ فِي صَلَوةٍ مَا انْتَهَكَ الصَّلَاةَ
 (رواه البخاري واللفظ له ومسلم
 والبوداؤد والترمذی وابن ماجه
 كذا في الترغيب)

اور رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور جب تک
 آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے وہ نماز کا
 ثواب پاتا رہتا ہے۔

(২) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, কোন ব্যক্তির ঐ নামায যাহা জামাতের সহিত পড়া হইয়াছে উহা ঘরে বা বাজারে একাকী পড়া নামায হইতে পঁচিশ বার দ্বিগুণ সওয়াব রাখে। কেননা, কোন ব্যক্তি যখন উত্তমরূপে ওযু করে, অতঃপর মসজিদের দিকে একমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যেই গমন করে, অন্য কোন উদ্দেশ্য তাহার না থাকে তখন তাহার প্রতি কদমে একটি করিয়া নেকী বাড়িয়া যায় এবং একটি করিয়া গোনাহ মাফ হইয়া যায়। অতঃপর যখন নামায পড়িয়া ঐ স্থানে বসিয়া থাকে, যতক্ষণ সে ওযুর সহিত বসিয়া থাকে ফেরেশতাগণ তাহার জন্য মাগফেরাত ও রহমতের দোয়া করিতে থাকেন। আর যতক্ষণ কেহ নামাযের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে ততক্ষণ সে নামাযের সওয়াব পাইতে থাকে। (তারগীবঃ বুখারী)

ফায়দাঃ প্রথম হাদীসে সাতাইশ গুণ বেশী এবং এই হাদীসে পঁচিশ গুণ বেশী সওয়াবের কথা বলা হইয়াছে। দুই হাদীসের পার্থক্যের বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম অনেক উত্তর প্রদান করিয়াছেন যাহা হাদীসের ব্যাখ্যার কিতাবসমূহে উল্লেখিত আছে। তন্মধ্যে হইতে একটি এই যে, ইহা নামাযীদের অবস্থার পার্থক্যের কারণেই হইয়া থাকে। অর্থাৎ কেহ পঁচিশ গুণ সওয়াব পায় আর কেহ এখলাসের দরুণ সাতাইশ গুণ পায়। কোন কোন আলেমের মতে যেসমস্ত নামাযে কেরাত আস্তে পড়া হয় উহাতে পঁচিশ গুণ আর যে সমস্ত নামাযে কেরাত উচ্চস্বরে পড়া হয় উহাতে সাতাইশ গুণ সওয়াব হয়। আবার কেহ কেহ এশা ও ফজরের জন্য সাতাইশ গুণ বলিয়াছেন। কেননা, এই দুই সময়ে নামাযের জামাতে উপস্থিত হওয়া কষ্টকর মনে হয়। আর পঁচিশগুণ বলিয়াছেন বাকী তিন ওয়াক্তের জন্য। কোন কোন ব্যাখ্যাদানকারী লিখিয়াছেন, এই উম্মতের উপর সর্বদা আল্লাহ তাযালার নেয়ামতের বৃষ্টি বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে, যেমন অনেক ক্ষেত্রেই ইহার প্রকাশ ঘটিয়াছে। কাজেই প্রথমে পঁচিশ গুণ ছিল পরে উহা বাড়িয়া সাতাইশ গুণ হইয়াছে। কোন কোন ব্যাখ্যাকার এক চমৎকার কথা লিখিয়াছেন। তাহারা লিখিয়াছেন যে, এই হাদীসে বর্ণিত

সওয়াব প্রথম হাদীসে বর্ণিত সওয়াব হইতে অনেক বেশী। কেননা, এই হাদীসে পঁচিশগুণ বেশী হওয়ার কথা এরশাদ হয় নাই বরং পঁচিশ বার দ্বিগুণ সওয়াবের কথা এরশাদ করা হইয়াছে। অর্থাৎ পঁচিশ বার পর্যন্ত দ্বিগুণ সওয়াব হইতে থাকে। এই হিসাবে জামাতের সহিত এক নামাযের সওয়াব তিন কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার চারিশত বত্রিশ (৩,৩৫,৫৪,৪৩২) গুণ হয়। আল্লাহ তাযালার অসীম রহমতের কাছে এই সওয়াব কিছুমাত্রও অসম্ভব নয়। আর যেহেতু নামায ত্যাগ করার গোনাহ এক হোকবা, যাহার পরিমাণ উপরে বর্ণিত হইয়াছে, কাজেই সেই অনুপাতে নামাযের সওয়াবও এতবেশী হওয়াই যুক্তিসঙ্গত।

অতঃপর হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইদিকে ইশারা করিয়াছেন যে, ইহা তো নিজেরই চিন্তা করার বিষয় যে, জামাতের নামাযে কি পরিমাণ সওয়াব রহিয়াছে এবং কতভাবে নেকী বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঘর হইতে ওযু করিয়া শুধুমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যেই মসজিদে রওয়ানা হয়, তাহার প্রতি কদমে একটি করিয়া নেকী বৃদ্ধি পাইতে থাকে আর একটি করিয়া গোনাহ মাফ হইতে থাকে।

মদীনা শরীফে বনু সালামা নামে একটি গোত্র ছিল। তাহাদের ঘর-বাড়ী মসজিদ হইতে দূরে ছিল। তাহারা মসজিদের নিকটবর্তী কোন স্থানে আসিয়া বসবাস করিতে ইচ্ছা করিল। হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা সেখানেই থাক। তোমাদের মসজিদে আসার প্রতিটি কদম লিখা হয়।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি ঘর হইতে ওযু করিয়া নামাযের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়, সে যেন এহরাম বাঁধিয়া হজ্জের জন্য রওয়ানা হইল। অতঃপর হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও একটি ফযীলতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, নামায শেষ করিবার পর যতক্ষণ নামাযের স্থানে বসিয়া থাকে ফেরেশতারা ততক্ষণ পর্যন্ত গোনাহ মাফ ও রহমতের জন্য দোয়া করিতে থাকে। ফেরেশতাগণ নিষ্পাপ ও আল্লাহর প্রিয় বান্দা, কাজেই তাহাদের দোয়ার বরকত স্পষ্ট বিষয়।

মুহাম্মদ ইবনে সামাআহ (রহঃ) একজন বুযুর্গ আলেম ছিলেন। তিনি ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর শাগরেদ ছিলেন। একশত তিন বৎসর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। ঐ সময় তিনি দৈনিক দুইশত রাকাত নফল নামায পড়িতেন। তিনি বলেন, একাধারে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত শুধুমাত্র একবার ব্যতীত কখনও আমার তকবীরে উলা ছুটে নাই। যেদিন আমার মায়ের ইন্তেকাল হয় সেদিন ব্যস্ততার কারণে আমার

তকবীরে উলা ছুটিয়া গিয়াছিল। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, একবার আমার জামাতের নামায ছুটিয়া গিয়াছিল। যেহেতু জামাতের নামাযের সওয়াব পঁচিশ গুণ বেশী হয়, সেহেতু ঐ নামাযকে পঁচিশবার পড়িলাম, যাহাতে ঐ সংখ্যা পূর্ণ হইয়া যায়। আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, একব্যক্তি আমাকে বলিতেছে ; “হে মুহাম্মদ! পঁচিশবার নামায তো তুমি পড়িয়া নিলে কিন্তু ফেরেশতাদের আমীনের কি হইবে?” (ফাওয়ায়েদে বাহিয়াহ)

ফেরেশতাদের আমীনের অর্থ এই যে, বহু হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যে, ইমাম যখন সূরা ফাতেহার পর আমীন বলে, তখন ফেরেশতারাও আমীন বলে। যে ব্যক্তির আমীন ফেরেশতাদের আমীনের সহিত একত্রে হয়, তাহার অতীতের সকল গোনাহ মাফ হইয়া যায়। উপরোক্ত স্বপ্নের মধ্যে এই হাদীসের দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

মাওলানা আব্দুল হাই চাহেব (রহঃ) বলিয়াছেন যে, এই ঘটনার মধ্যে এই কথা বুঝানো হইয়াছে যে, সম্মিলিতভাবে জামাতের নামাযে যে ছওয়াব হাসিল হয়, উহা একাকী নামায পড়িলে কিছুতেই হাসিল হইতে পারে না ; যদিও এই নামাযকে এক হাজার বার পড়ে। আর এই কথা তো সহজেই বুঝে আসে যে, জামাতে নামায পড়ার মধ্যে শুধু ফেরেশতাদের সাথে আমীনের ফযীলতই নহে, বরং জামাতে শরীক হওয়া, নামায শেষে ফেরেশতাদের দোয়া পাওয়াও রহিয়াছে যাহা এই হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, এই সব ফযীলত ছাড়াও আরও অনেক বিষয় রহিয়াছে, যাহা একমাত্র জামাতের মধ্যেই পাওয়া যাইতে পারে। আবার একটি জরুরী বিষয় ইহাও খেয়াল রাখিতে হইবে যে, ওলামায়ে কেরাম লিখিয়াছেন : ফেরেশতাদের দোয়া পাওয়ার উপযুক্ত তখনই হইবে যখন নামায সত্যিকারের নামায হইবে, পুরান কাপড়ের ন্যায় পঁচাইয়া মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া দেওয়ার মত যদি নামায হয়, তবে উহা ফেরেশতাদের দোয়ার উপযুক্ত হইবে না। (বাহজাত)

حضرت عمرؓ بن موعود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ کل قیامت کے دن اللہ جلّ شانہ کی بارگاہ میں مسلمان بن کر حاضر ہو وہ ان مآذیہ کو ایسی جگہ ادا کر لے لیا کہ جہاں اذان ہو تی ہے (یعنی مسجد میں) اسے کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

(٣) عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَنْ سَرَّهُ
 أَنْ يَأْتِيَ اللَّهَ عَدَا مُسْلِمًا فَلْيَحَافِظْ
 عَلَى لُؤْلُؤِ الصَّلَاةِ حَيْثُ يَدَايِ
 بِهِمَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى شَرَعَ لِبَيْتِكُمْ
 صَلَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى
 وَإِنَّكُمْ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنْتُمْ

جاری فرمائی ہیں جو سراسر ہدایت ہیں انہیں میں سے یہ جماعت کی نمازیں بھی ہیں، اگر تم لوگ اپنے گھر میں نماز پڑھنے لگو گے جبکہ فلاں شخص بڑھتا ہے تو تم ہی صَلَّی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے چھوڑنے والے ہو گے اور یہ سمجھ لو کہ اگر نبی اکرم صَلَّی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے تو مگر ہر جو باد گئے اور جو شخص

اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد مسجد کی طرف
جائے تو ہر قدم پر ایک ایک نیکی لکھی جائے
گی اور ایک ایک خطا مٹا دے گی اور ہم تو اپنا
یہ حال دیکھتے تھے کہ جو شخص کھلم کھلا منافق ہو وہ تو
جہنم سے رہا تھا اور حضورؐ کے زمانہ میں عام منافقوں
کی بھی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہ ہوتی تھی یا کوئی
سخت بیمار اور نہ جو شخص دو آدمیوں کے سہارے
گھٹتا ہوا جا سکتا تھا وہ بھی صفت میں کھرا کرنا
ماتا تھا۔

صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا أَصَلَّيْتُمْ هَذَا
الْمَسْجِدَ فِي بَيْتِهِ لَكُمْ سُنَّةَ
نَبِيِّكُمْ وَكَوْنُوا تَرْكَلُوهُ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ
لَصَلَّاهُ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ
فِي حَيْثُ الظُّهُورِ ثُمَّ يَعْبُدُ إِلَى
مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ
اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يُخْطُوهَا حَسَنَةً
وَيَرْفَعُهَا بِهَا دَرَجَةً وَيُحِيطُ عَنْهُ
بِهَا سِتْرُهُ وَلَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا تَخْلُفُ
عَنْهَا إِلَّا مَنَاقِفُ مَعْلُومُ الرِّفَاقِ
وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهَا يَهْدِي
بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُعَامَ فِي الصَّفِّ
فِي رَايَةِ لَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا تَخْلُفُ
عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مَنَاقِفُ قَدْ عَلِمْنَا فَاقَهُ
أَوْ مَرِئُصُ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ كَيْشِي
بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ.

وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَا سُنَنَ الْهُدَى وَكَانَ مِنْ سُنَنِ
الْهُدَى الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَدَّنُ فِيهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَإِبْنُ مَاجَةَ
كَذَا فِي التَّرْغِيبِ وَالدَّرَالْمَنْثُورِ وَالسَّنَةُ نَوَاعِنُ سَنَةِ الْهُدَى وَتَارِكُهَا لَا يَسْتَوْجِبُ
إِسَاءَةً كَالْجَمَاعَةِ وَالْإِذَاانَ وَالزَّوَاعِدَ وَتَارِكُهَا لَا يَسْتَوْجِبُ إِسَاءَةً كَبِيرَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِبَاسِهِ وَقَعُودِهِ كَذَا فِي نَوْرِ الْأَنْوَارِ وَالْإِضَافَةُ فِي
سَنَةِ الْهُدَى بَيَانِيَّةٌ أَيْ سَنَةٌ هِيَ هَدَى وَالْعَمَلُ مُبَالَغَةٌ كَذَا فِي
فَعْرِ الْاِقْتِبَارِ

৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা দরবারে মুসলমানরূপে হাজির হইতে চায়, সে যেন এই নামাযসমূহকে এমন স্থানে আদায় করার এহতেশাম

করে যেখানে আযান হয় (অর্থাৎ মসজিদে)। কেননা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের নবী আলাইহিস-সালামের জন্য এমন সুন্নতসমূহ জারী করিয়াছেন, যেইগুলি সম্পূর্ণই হেদায়েত। এই সমস্ত সুন্নতের মধ্যে জামাতের সহিত নামায আদায় করাও রহিয়াছে। যদি অমুক ব্যক্তির ন্যায় তোমরাও ঘরে নামায পড়িতে আরম্ভ কর, তবে তোমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত ত্যাগকারী হইবে। আর ইহা জানিয়া রাখ যে, যদি তোমরা নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে ত্যাগ কর, তবে গোমরাহ হইয়া যাইবে। আর যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করে এবং মসজিদের দিকে অগ্রসর হয়, তাহার প্রতি কদমে একটি করিয়া নেকী লেখা হইবে এবং একটি করিয়া গোনাহ মাফ করা হইবে। (হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায়) আমরা নিজেদের অবস্থা এরূপ দেখিতাম—যে-ব্যক্তি খোলাখুলি মুনাফেক, সে-ই কেবল জামাতে শামিল হইত না। নতুবা সাধারণ মুনাফেকরাও জামাত ছাড়িয়া দেওয়ার সাহস করিত না। অথবা কাহারও কঠিন রোগ হইলে জামাতে হাজির হইতে পারিত না। অন্যথায় যে-ব্যক্তি দুইজনের উপর ভর করিয়া হেঁচড়াইয়া যাইতে পারিত, তাহাকেও জামাতের সহিত কাতারে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইত। (তারগীব : মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ)

ফায়দা : সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমের নিকট জামাতের এত এহতেমাম ছিল যে, অসুস্থ অবস্থায়ও কোন রকমে জামাতে উপস্থিত হওয়ার শক্তি থাকিলে তাঁহারা অবশ্য জামাতে শরীক হইতেন। এমনকি দুইজন লোকের সাহায্য গ্রহণ করিয়া হইলেও যদি যাওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলেও তাঁহারা জামাত ত্যাগ করিতেন না। আর কেনই বা এমন হইবে না—তাহাদের ও আমাদের মনিব নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই এইরূপ এহতেমাম করিতেন। এইজন্যই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতকালের অসুস্থতার সময়ও ঠিক এইরূপ অবস্থাই পরিলক্ষিত হইয়াছে। রোগ-যন্ত্রণায় বারবার বেঁহুঁশ হইয়া পড়িতেছিলেন, কয়েকবার ওযুর জন্য পানি চাহিলেন। অবশেষে একবার ওযু করিলেন এবং হযরত আব্বাস (রাযিঃ) এবং অন্য একজন সাহাবীর সাহায্যে মসজিদে তশরীফ লইয়া গেলেন। তখন অবস্থা এই ছিল যে, ভালভাবে তাঁহার পা মোবারক মাটিতে জমাইয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহারই নির্দেশে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) নামায পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, হুযূর (সাঃ) পৌছিয়া জামাতে শরীক হইলেন।

(বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহর এবাদত করিবার সময় অন্তরে এইরূপ ধারণা করিবে যে, তিনি তোমার একেবারে সম্মুখে এবং তুমি তাহাকে দেখিতে পাইতেছ। তুমি নিজেকে মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন মনে করিবে। (নিজেকে জীবিতদের মধ্যে মনেই করিবে না, তখন না কোন ব্যাপারে আনন্দ হইবে না দুঃখ।) মজলুমের বদদোয়া হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিবে। যদি তুমি এতটুকু শক্তি রাখ যে, জমিনে হামাগুড়ি দিয়া হইলেও এশা ও ফজরের জামাতে হাজির হইতে পার, তবে ইহাতে অবহেলা করিবে না।

এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, এশা এবং ফজরের নামায মুনাফেকদের জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। যদি তাহাদের জানা থাকিত যে, জামাতের সওয়াব কত বেশী, তাহা হইলে জমিনে হেঁচড়াইয়া হইলেও আসিয়া জামাতে শরীক হইত। (তারগীব)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى اللَّهُ أَلْبَعِينَ يَوْمًا فِي جَمَاعَةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كَتَبَ لَهُ بِمِلَّتَيْنِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ.

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص چالیس دن اہل صلوٰۃ کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ پہلی آیت اولیٰ قوت نہ ہو تو اس کو دو بار ملے ہیں ایک پر وہ بہت سے چھٹکار کا۔ دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔

رواہ الترمذی وقال لا أعلم احدا رفعه الا ماروی مسلم بن قتیبہ عن طبعہ بن عمرو وقال المصنف وطبعہ وبقیۃ رواۃ ثقاة کذا فی الترغیب قلت له شواہد من حدیث عمر رفعہ من صلوٰۃ فی مسجد جماعۃ الربعین لیلۃ لا تقوتہ الرکعۃ الاولیٰ من صلوٰۃ العشاء کتب اللہ له بما عتقا من النار رواہ ابن ماجہ واللفظ له والترمذی وقال نحو حدیث انس یعنی المتقدم ولعمری ذکر لفظه وقال مرسل یعنی ان عبارة الراوی عن انس لو یدرک التکبیرۃ الاولیٰ من العشاء کتب اللہ له بملکتین براءة من النار وبراءة من النار فی الشعب وابن عسکر وابن النجار

⑧ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন এখলাসের সহিত এইভাবে নামায পড়ে যে, তাহার তকবীরে উলা ছুটে না তবে সে দুইটি পরওয়ানা লাভ করিবে—একটি

النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحها والحاكم وقد جزم يحيى بن معين و
الذهلي بصحة هذا الحديث كذا في الترغيب

⑥ নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, দুই ব্যক্তির জামাতের নামায একজন ইমাম ও অপর জন মুক্তাদী হয় চারজন ব্যক্তির পৃথক পৃথক নামায অপেক্ষা আল্লাহর নিকট বেশী প্রিয়। অনুরূপভাবে চার জনের জামাতে নামায আট আটজনের পৃথক পৃথক নামায অপেক্ষা অধিক উত্তম। আর আটজনের জামাতের নামায একশত জনের পৃথক পৃথক নামায অপেক্ষা উত্তম।

(তারগীব : বাযহার, তাবারানী)

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, এইভাবে যত বড় জামাতে নামায পড়া হইবে, আল্লাহর নিকট উহা ছোট জামাত অপেক্ষা তত বেশী পছন্দনীয় হইবে।

ফায়দা : যাহারা এই কথা মনে করেন যে, দুই-চারজন লোক একত্রে মিলিয়া ঘরে বা দোকান ইত্যাদিতে জামাত করিয়া নিলেই যথেষ্ট হইবে—প্রথমতঃ ইহাতে শুরু হইতেই মসজিদে নামায পড়ার সওয়াব হয় না। দ্বিতীয়তঃ বড় জামাতের সওয়াব হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়—কেননা, জামাত যত বড় হইবে, আল্লাহ তায়ালা নিকট উহা তত বেশী প্রিয় হইবে। আর যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই একটি কাজ করিতে হইবে, তখন সেই কাজটি যে তরীকায় করিলে আল্লাহ তায়ালা বেশী সন্তুষ্ট হইবেন সেভাবেই করা উচিত।

এক হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা তিনটি জিনিস দেখিয়া খুশী হন—এক, জামাতের কাতার। দ্বিতীয়, যে ব্যক্তি মধ্যরাত্রে উঠিয়া (তাহাজ্জুদ) নামায পড়িতেছে। তৃতীয়, যে ব্যক্তি কোন সৈন্যদলের সহিত জেহাদ করিতেছে। (জামে সগীর)

④ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَرَأَى النَّسَائِيُّ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسْجِدِ بِالنُّورِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -
حضرت سہل بن سعد نے فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اندھیرے میں مسجدوں میں بکثرت جاتے رہتے ہیں۔ اُن کو قیامت کے دن کے پورے پورے نور کی خوشخبری سنائے۔

رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم واللفظ له وقال صحيح على شرط الشيخين
كذا في الترغيب وفي المشكاة برواية الترمذي وابن داود عن بريدة ثم قال رواه

ابن ماجه عن سهل ابن سعد وانشاء قلت وله شاهد في منتخب كنز العمال
برواية الطبراني عن ابي امامة بلفظ بشر المذبحين الى المساجد في الظلم يستأبر
من نور يوم القيامة يفرح الناس ولا يفرحون ذكر السيوطي في البدل المنثور في تفسيد
قوله تعالى انا يعمر مساجد الله عدة روايات في هذا المعنى

⑦ হযরত সাহল (রাযিঃ) বলেন, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যাহারা অন্ধকারে বেশী বেশী মসজিদে গমন করিতে থাকে, তাহাদিগকে কিয়ামত-দিবসের পূর্ণ নূরের সুসংবাদ দান কর। (তারগীব : ইবনে মাজাহ, ইবনে খুযাইমাহ)

ফায়দা : আজ দুনিয়াতে অন্ধকার রাত্রিতে মসজিদে যাওয়ার কদর তখন বুঝে আসিবে, যখন কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যের সম্মুখীন হইবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি মুছীবতের মধ্যে গ্রেফতার থাকিবে। আজকের অন্ধকারে কষ্টের বদলা ও উহার মূল্য সেই সময় হইবে যখন সূর্য অপেক্ষা অধিক আলোময় এক উজ্জ্বল নূর তাহাদের সঙ্গে হইবে।

অপর এক হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা কিয়ামতের দিন নিশ্চিন্তমনে নূরের মিস্বরে অবস্থান করিবে এবং অন্যান্যরা ভয় ও আতঙ্কের মধ্যে থাকিবে। এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ ফরমাইবেন—আমার প্রতিবেশীরা কোথায়? ফেরেশতারা আরজ করিবে, আপনার প্রতিবেশী কাহারো? এরশাদ হইবে, যাহারা মসজিদ আবাদ করিত।

এক হাদীসে আসিয়াছে, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় স্থান হইল মসজিদ আর সর্বাধিক অপরিয় স্থান হইল বাজার।

এক হাদীসে আছে, মসজিদসমূহ জান্নাতের বাগান। (জামে সগীর)

একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে নকল করেন, তোমরা যাহাকে মসজিদে যাইতে অভ্যস্ত দেখ তাহার ঈমানদার হওয়ার সাক্ষ্য দাও।

(জামে সগীর)

انما يعمّر مساجد الله : অতঃপর এই আয়াত তেলাওয়াত করিলেন :
অর্থাৎ, যাহারা আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত-দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, তাহারাই মসজিদসমূহকে আবাদ করে।

(সূরা তওবা, আয়াত : ১৮) (দুররে মানসূর)

এক হাদীসে আছে, কষ্টের সময় ওযু করা, মসজিদের দিকে যাওয়া এবং এক নামাযের পর আরেক নামাযের অপেক্ষায় বসিয়া থাকা

গোনাহসমূহকে ধৌত করিয়া দেয়। (জামে সগীর)

আরেক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি মসজিদ হইতে যত দূরে হইবে তাহার সওয়াবও তত বেশী হইবে। (জামে সগীর) কারণ, কদমে কদমে সওয়াব লিখিত হইতে থাকে—মসজিদ যত দূরে হইবে কদমও তত বেশী হইবে। এই কারণেই কোন কোন সাহাবী মসজিদের দিকে যাইতে ছোট ছোট কদম রাখিতেন।

এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, তিনটি কাজের সওয়াব যদি মানুষের জানা থাকিত, তবে যুদ্ধ করিয়া হইলেও উহা লাভ করিত। এক, আযান দেওয়া। দ্বিতীয়, দুপুরের সময় জামাতে নামায পড়িবার জন্য যাওয়া। তৃতীয়, প্রথম কাতারে নামায পড়া। (জামে সগীর)

এক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, কিয়ামতের দিন যখন প্রত্যেক মানুষ অস্থির হইবে এবং সূর্য অত্যন্ত প্রখর হইবে তখন সাত প্রকারের লোক আল্লাহ তায়ালার রহমতের ছায়ায় আশ্রয় পাইবে। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি সেও হইবে যাহার মন সর্বদা মসজিদে আটকাইয়া থাকে। যখন মসজিদ হইতে কোন প্রয়োজনে বাহিরে আসে পুনরায় মসজিদেই ফিরিয়া যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা হয়।

এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, মসজিদের প্রতি যে-ব্যক্তি মহব্বত রাখে, আল্লাহ তায়ালাও তাহার প্রতি মহব্বত রাখেন। (জামে সগীর)

পবিত্র শরীয়তের প্রত্যেকটি হুকুমের মধ্যে যেমন সীমাহীন খায়র-বরকত ও সওয়াব রহিয়াছে, তেমনিভাবে উহার মধ্যে বহুপ্রকার কল্যাণও নিহিত রহিয়াছে। যাহার প্রকৃত রহস্য উদঘাটন অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার; কারণ আল্লাহ তায়ালার অসীম জ্ঞান ও উহার মধ্যকার নিহিত কল্যাণ উদঘাটনের সাধ্য কাহার আছে? তথাপি নিজ নিজ যোগ্যতা ও হিম্মত অনুপাতে প্রত্যেকের জ্ঞানের পরিধি হিসাবে উহার কল্যাণও বুঝে আসে। যাহার যত বেশী যোগ্যতা হয় ততই শরীয়তের হুকুমের মধ্যে নিহিত গুণাগুণ বা উপকারিতা বুঝে আসিতে থাকে। সুতরাং ওলামায়ে কেরাম নিজ নিজ জ্ঞান অনুসারে জামাতে নামাযের কল্যাণসমূহও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমাদের হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (রহঃ) ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা’ কিতাবে এই বিষয়ে একটি অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। উহার তরজমা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

(এক) প্রচলিত কুপ্রথা ও সামাজিক কুসংস্কারের ধ্বংসাত্মক পরিণতি হইতে বাঁচার জন্য ইহা অপেক্ষা অধিক উপকারী কোন জিনিস নাই যে, এবাদতসমূহের মধ্য হইতে একটি এবাদতের এমন ব্যাপক প্রচলন ঘটানো

হয় যে, উহা জ্ঞানী-মূর্খ নির্বিশেষে সকলের সম্মুখে প্রকাশ্যে আদায় করা যাইতে পারে। যাহা আদায়ের ব্যাপারে শহর ও গ্রামবাসী সকলেই সমান হয়। একমাত্র ইহাই তাহাদের প্রতিযোগিতা ও গর্বের বস্তু হয়, আর ইহা এমন ব্যাপক আকার ধারণ করে যে, জীবনের এমন প্রয়োজনীয় বস্তুতে পরিণত হয় যাহা হইতে আলাদা থাকা কঠিন ও অসম্ভব হইয়া পড়ে। যাহাতে এই ব্যাপকতা আল্লাহর এবাদতের ব্যাপারে সাহায্যকারী হইয়া যায় এবং ঐ সকল প্রচলিত কুপ্রথা ও কুসংস্কারগুলি যাহা পূর্বে ক্ষতি ও ধ্বংসের কারণ ছিল উহাই হক ও সত্যের দিকে আকর্ষণকারী হইয়া যায়। যেহেতু এবাদতসমূহের মধ্যে নামাযের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং দলীল-প্রমাণের দিক দিয়া অধিকতর মজবুত আর কোন এবাদত নাই, এইজন্য নিজেদের মধ্যে অধিক পরিমাণে ইহার প্রচলন ঘটানো এবং ইহার জন্য বিশেষ সমাবেশের ব্যবস্থা করা ও পরস্পর একমত হইয়া ইহাকে আদায় করা একান্ত জরুরী সাব্যস্ত হইয়াছে।

(দুই) প্রত্যেক মাহযাব ও ধ্বিনের মধ্যে এমন একদল লোক থাকে যাহারা অন্যান্যদের জন্য অনুসরণীয় হয়। আবার কিছু লোক দ্বিতীয় স্তরে এমনও থাকে যাহাদিগকে একটু উৎসাহ প্রদান বা সচেতন করিবার প্রয়োজন দেখা দেয়। আরও কিছু দুর্বল ও কমজোর লোক তৃতীয় স্তরে এমন থাকে, যাহাদিগকে সকলের সাথে সমাবেশে এবাদতের জন্য বাধ্য না করা হইলে তাহারা অবহেলা ও গাফলতির দরুন এবাদতই ছাড়িয়া দেয়। কাজেই অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োজন ইহাই যে, সকলেই জামাতবন্দী হইয়া এবাদত আদায় করিবে। এই পন্থা অবলম্বনের কারণে এবাদত পরিত্যাগকারীগণ এবাদতকারীদের হইতে পৃথক হইয়া যাইবে এবং এবাদতে আগ্রহী ও অনাগ্রহীদের মধ্যে খোলা পার্থক্য হইয়া যাইবে। এমনভাবে ওলামাদের অনুসরণ করার দ্বারা অজ্ঞ লোকেরা জ্ঞানী হইয়া যাইবে এবং জাহেল ও মূর্খরা এবাদতের তরিকা জানিতে পারিবে। এইভাবে এবাদত তাহাদের জন্য অভিজ্ঞ লোকের সম্মুখে গলানো চান্দি রাখার মত হইবে। যাহাতে জায়েয, নাজায়েয ও খাঁটি-ভেজালের মধ্যে খোলাখুলি পার্থক্য হইয়া যায়—অতঃপর জায়েযকে মজবুত করা হয় আর নাজায়েযকে দূর করা হয়।

(তিন) ইহা ছাড়া যেখানে আল্লাহর প্রতি অনুরাগ রাখে, আল্লাহর রহমত তলব করে এবং আল্লাহকে ভয় করে এমন লোক উপস্থিত থাকেন এবং সকলেই সর্বান্তঃকরণে একমাত্র আল্লাহ পাকের দিকেই রুজু থাকেন, মুসলমানদের এরূপ সমাবেশ বরকত নাযিল হওয়া এবং আল্লাহর রহমত

আকর্ষণ করার ব্যাপারে আশ্চর্য ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য রাখে।

(চার) উম্মতে মুহাম্মাদিয়া কায়ম হওয়ার উদ্দেশ্যই হইল আল্লাহর আওয়াজ বুলন্দ হউক এবং দীন-ইসলাম বিজয়ী ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হউক। আর এই উদ্দেশ্য ততক্ষণ পর্যন্ত সফল হইতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজের সর্বসাধারণ ও বিশিষ্ট লোকগণ, শহরবাসী ও গ্রামবাসী এবং ছোট বড় নির্বিশেষে সকলেই এক জায়গায় জমা হইয়া ইসলামের সবচেয়ে বড় এবং প্রতীকী নিদর্শনবাহী এবাদতকে আদায় না করিবে। এই নিগূঢ় রহস্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শরীয়ত জুমআ এবং জামাতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে, এইগুলিকে প্রকাশ্যে জনসমক্ষে আদায় করিতে উৎসাহিত করিয়াছে এবং এইগুলিকে পরিত্যাগ করার পরিণামে শাস্তির কথা নাযিল হইয়াছে।

মুসলমানদের এই সমাবেশ যেহেতু দুই পর্যায়ে হইতে পারে—গ্রাম বা মহল্লা পর্যায়ে এবং সম্পূর্ণ শহর পর্যায়ে, আর গ্রাম বা মহল্লার সমাবেশ সবসময়ই সহজ, পক্ষান্তরে সারা শহর পর্যায়ের সমাবেশ করা কঠিন ও কষ্টকর। কাজেই প্রত্যেক নামাযের সময় জামাতের নামাযের মাধ্যমে মহল্লার সমাবেশ এবং অষ্টম দিনে শহরের সমাবেশ জুমার নামাযের মাধ্যমে সাব্যস্ত করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

জামাত ত্যাগ করার শাস্তি

আল্লাহ তায়ালা তাঁহার হুকুম পালন করিলে যেমন পুরস্কারদানের ওয়াদা করিয়াছেন, তেমনি তাঁহার হুকুম অমান্য করিলে অসন্তুষ্টি ও শাস্তির ঘোষণাও করিয়াছেন। ইহাও আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ যে, হুকুম পালন করিলে তিনি অফুরন্ত নেয়ামত ও পুরস্কারের ওয়াদা করিয়াছেন। নতুবা বান্দা হিসাবে তো শুধু শাস্তি হওয়াই উচিত ছিল। কেননা, বান্দার কর্তব্য হইল হুকুম পালন করিয়া যাওয়া—ইহার জন্য আবার পুরস্কার কিসের? অপরদিকে মনিবের নাফরমানীর চেয়ে বড় অপরাধ আর কি হইতে পারে—সেইজন্য যতই শাস্তি দেওয়া হউক তাহা অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। সুতরাং বিশেষ কোন শাস্তি উল্লেখ করার প্রয়োজন ছিল না। তবুও আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীমাহীন মহব্বত ও মেহেরবানী এই যে, ভাল-মন্দ বর্ণনা করিয়া বিভিন্নভাবে সতর্ক করিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন। এতদসত্ত্বেও যদি আমরা না বুঝি তবে নিজেদেরই ক্ষতি করিব।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ مِنْ سَمِعٍ انْتِدَاءً فَكَمْ يَسْتَعِ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُدُوُّ قَاتِلِهِ وَمَا الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ لَمْ تَقْبَلْ مِنْهُ الْعُسْلُوكَةُ النَّجَى صَلَّى

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اذان کی آواز سے اور بلا کسی عذر کے نماز کو نہ جاتے (وہیں پڑھ لے) تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ عذر سے کیا مراد ہے۔ ارشاد ہوا کہ اگر مرض ہو یا کوئی خوف ہو۔

رواه البوداؤد وابن حبان في صحيحه وابن ماجة بنحوه كذا في الترغيب وفي المشكاة
رواه البوداؤد والدارقطني

১) নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনিয়া কোনরকম ওজর ব্যতীত জামাতে হাজির হয় না (নিজের জায়গাতেই নামায পড়িয়া নেয়), তাহার নামায কবুল হয় না। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ওজর বলিতে কি বুঝায়? বলিলেন, অসুস্থতা বা ভয়-ভীতি।

(তারগীব : আবু দাউদ, ইবনে হিব্বানঃ মিশকাত : আবু দাউদ, দারাকুতুনী)

ফায়দা : কবুল না হওয়ার অর্থ এই যে, এই নামায পড়া দ্বারা আল্লাহর তরফ হইতে যে পুরস্কার ও সওয়াব পাওয়া যাইত তাহা পাওয়া যাইবে না। অবশ্য ফরজ আদায় হইয়া যাইবে। যে সমস্ত হাদীসে নামায না হওয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে সেই সকল হাদীসেরও ব্যাখ্যা ইহাই। কেননা, এমন হওয়াকে কি হওয়া বলা যায় যাহাতে কোন পুরস্কার বা সম্মান পাওয়া গেল না? ইহা আমাদের ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর অভিমত। নতুবা কিছুসংখ্যক সাহাবী ও তাবееীগণের মতে বিনা ওজরে জামাত ত্যাগ করা হারাম এবং জামাতে নামায আদায় করা ফরজ। এমনকি অনেক ওলামায়ে কেরামের মতে নামাযই হয় না। হানাফী আলেমগণের মতে নামায যদিও হইয়া যাইবে কিন্তু জামাত তরক করার কারণে অবশ্যই অপরাধী সাব্যস্ত হইবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত এক হাদীসে ইহাও নকল করা হইয়াছে যে, এই ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানী করিয়াছে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করিয়াছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) ইহাও ফরমাইয়াছেন যে, যে ব্যক্তি আযানের আওয়াজ শুনিয়াও জামাতে শরীক হয় না সে নিজেও মঙ্গল কামনা করে নাই এবং তাহার সহিতও মঙ্গল কামনা করা হয় নাই। হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) বলেন, যে ব্যক্তি

আযান শুনিয়া জামাতে শরীক হইল না তাহার কান গলিত সীসা দ্বারা ভরিয়া দেওয়াই উত্তম।

عَنْ مَعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْجَعَاءُ كُفْرٌ وَالْجَفَاءُ الْكُفْرُ الْيَقَاقُ مَنْ سَمِعَ مَنَادِيَ اللَّهِ يَمْنَعُ دَعْوَى إِلَى الصَّلَاةِ فَكَأَنَّهُ يَجِيبُهُ. (۲)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سرسرس ظلم ہے اور کفر ہے اور جفا ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی یعنی مَنَادِی کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔

رواه احمد والطبرانی من رواية زبان بن فائد كذا في الترغيب وفي مجمع الزوائد رواه الطبرانی في المعجمين وزبان ضعفه ابن معين ووثقه ابو حاتم واه وعزاه في الجامع الصغير الى الطبرانی ورقعه له بالضعف

نবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, ঐ ব্যক্তির কাজ একেবারে জুলুম, কুফর এবং মুনাফেকী, যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহবানকারীর (মুআযযিনের) ডাক শুনিয়াও মসজিদে হাজির হয় না। (তারগীব : আহমদ, তাবারানী)

ফায়দা : উক্ত হাদীস শরীফে কত কঠোরভাবে সতর্ক করা হইয়াছে এবং ধমক দেওয়া হইয়াছে যে, যাহারা জামাতে হাজির হয় না তাহাদের এই কাজকে কাফের ও মুনাফেকদের কাজ বলা হইয়াছে। যেন এমন কাজ মুসলমানের দ্বারা হইতেই পারে না। আরেক হাদীসে এরশাদ হইয়াছে, মানুষের দুর্ভাগ্যের জন্য ইহাই যথেষ্ট যে, মুআযযিনের আযান শুনিয়া মসজিদে হাজির হয় না।

হযরত সুলাইমান ইবনে আবী হাছমা (রাযিঃ) খুবই উচ্চ মর্তবার সাহাবী ছিলেন। তিনি হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু অল্প বয়স হওয়ার কারণে তাঁহার নিকট হইতে হাদীস বর্ণনা করার সুযোগ হয় নাই। হযরত ওমর (রাযিঃ) তাহাকে বাজারের তদারকী কাজের দায়িত্ব দিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে একদিন ফজরের জামাতে শরীক হইতে পারেন নাই। হযরত ওমর (রাযিঃ) খবর নেওয়ার জন্য তাঁহার বাড়ীতে তশরীফ লইয়া গেলেন এবং তাঁহার মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুলাইমান আজ ফজরের নামাযে হাজির হয় নাই কেন? তাহার মা বলিলেন, সারারাত্র সে নফল নামাযে মশগুল ছিল; তাই ঘুমের চাপে চোখ লাগিয়া গিয়াছিল। হযরত ওমর (রাযিঃ) বলিলেন, রাতভর নফল পড়া অপেক্ষা ফজরের নামায জামাতে আদায়

করা আমার কাছে বেশী পছন্দনীয়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُمَرَ فَيُتِيَنِي فَيَجْعَلُونِي حُرْمًا مِنْ حَتْمٍ ثُمَّ أُنِي قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَاحْرَزْتُهَا عَلَيْهِمْ. (۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سا ایندھن تمھارا کر کے لائیں پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلا غرض گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔

رواه مسلم و ابو داؤد وابن ماجه والترمذی كذا في الترغيب قال السيوطی فی الدر اخرج ابن ابی شیبہ والبخاری ومسلم وابن ماجه عن ابی ہریرۃ رفعہ القلہ الصلوۃ علی المنافقین صلوۃ العشاء وصلوۃ الفجر ولو یعلمون ما فیہما لآؤہما ولو حبواً ولقد ہممت امر بالصلوۃ فتقام الحدیث بنحوہ

হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আমার ইচ্ছা হয় কিছু সংখ্যক যুবককে অনেকগুলি জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করিয়া আনিতে বলি। অতঃপর আমি এসব লোকের নিকট যাই, যাহারা বিনা ওজরে ঘরে নামায পড়িয়া নেয় এবং যাইয়া তাহাদের বাড়ী-ঘর পোড়াইয়া দেই। (তারগীব : মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজা, তিরমিযী)

ফায়দা : উক্তের প্রতি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়া ও মেহেরবানী এইরূপ ছিল যে, কোন ব্যক্তির সামান্যতম কষ্টও তিনি বরদাশত করিতে পারিতেন না। তাহা সত্ত্বেও যাহারা ঘরে নামায পড়িয়া নেয়, তাহাদের প্রতি তাঁহার এমনই রাগ যে, তিনি তাহাদের বাড়ী-ঘর আগুন দিয়া পোড়াইয়া দিতে প্রস্তুত।

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي فَرِيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَنَا نَامَ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكُمْ بِالْجُمُعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذُّبُّ مِنَ النَّعْمِ الْقَائِمَةِ. (۴)

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گاؤں یا جنگل میں تین آدمی ہوں اور وہاں باجماعت نماز نہ ہوتی ہو تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اسلئے جماعت کو ضروری سمجھو، بھیڑ یا کیلی بکری کو کھا جاتا ہے اور آدمیوں کا بھیڑ یا شیطان ہے۔

رواہ احمد والبود ائد والنائی وابن خزیمۃ وابن حبان فی صحیحہما والحاکم و
زاد رزین فی جامعہ وان ذئب الانسان الشیطان اذا خلا بہ اكلہ کذا فی
التزغیب ورقمہ فی الجامع الصغیر بالصحة وصححه الحاکم واقرة علیہ الذہبی

⑧ ہضور سالللاہ علیہ وسلم آلائیہی ویا سالللام ابرشاہ فرمائییاہن، یہ
گرامہ با مارٹہ کمپنکے تینجن لاک ٹاکہ آار سہانہ جاماٹہر
سہیت ناماے پڈا ہئ نا، تاہاڈہر اُپر شہتان ہرئاب ہیشار کرہیا
فہلہ۔ کاجہی جاماٹکے جُرُری مہنہ کر۔ دل تہاگکاری ہاگلکے باہے
ٹاہییا فہلہ۔ آار مانُشہر باہ ہئل شہتان۔

(تارگیب : آابُ داؤد، ناسائ، آاہماد)

فایدا : اُہی ہادیس دہارا بواا گہل یہ، یاہارا کفہت-ٹامارہ کاج
کرہ، تاہارا تینجن ہئلہو جاماٹہر سہیت ناماے آادای کرا
اُٹہت۔ ہرہ دُہجن ہئلہو جاماٹہ ناماے آادای کرا اُٹم۔
ساہارہت : کُشکرا ناماےہ پڈہ نا-کفہت-ٹامارہر ہسُتاکہ تاہارا
اُجر ہساہہ ہٹہٹ مہنہ کرہیا ٹاکہ۔ آار یاہادہگکے ہہش دُہنڈار
مہنہ کرا ہئ تاہاراو اُکا اُکای ناماے پڈہیا نہی۔ اٹٹ
کہیکجن کُشک اُکٹ ہئییا جاماٹہ ناماے پڈہیا نلہ کٹ ہڈ
جاماٹ ہئییا یای اہہ کٹ ہڈ سواہاہر اڈہکاری ہئٹہ پارہ۔
دُہ-ٹارہٹہ پہسا اُپارُجہنہر جنہ شہت-گرم، رُہڈ-ہٹہ سہکھ اُپہکٹا
کرہیا دہنڈر کاجہ مہشول ہئییا ٹاکہ، اٹٹ اُٹ ہڈ سواہاکہ
تاہارا ہرہاد کرہیا دہی، ہہار ہرہ تاہارا مٹہو ڈاکفہپ کرہ نا۔
اٹٹ تاہارا ہڈ مارٹہ جاماٹہر ساٹہ ناماے پڈہ تہہ آارو ہہش
سواہا ہئ۔ اُک ہادیسہ آاہہ، پٹٹاں ناماےہر سواہا ہئ۔

اُک ہادیسہ ہرہت ہئییاہہ، ہٹن کون راٹال کون پاہاڈہر
پاڈدہشہ اٹٹا مارٹہ آایان دہیا ناماے پڈہتہ آارٹ کرہ تٹن
آاللاہ تاہالا ٹُہہ ٹُشی ہن اہہ گہر کرہیا فہرہشٹادہگکے ہلہن،
ٹامرا دہٹ-آمار ہانڈا آایان دہیا ناماے پڈہتہ شُر کرہیاہہ،
آمار ہٹہی سہ اُہسہ کرہتہٹہ، آمہ تاہاکہ ماف کرہیا دہلام
اہہ تاہار جنہ آاللاٹہر فہساللا کرہیا دہلام۔ (مہشکات)

⑤ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ
كَعْبٍ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ وَ
حَضْرَتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ كَيْسٍ نَزَّاهِي
كَهَيْكَلٍ يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ وَ

لَا يَشْهَدُ الْجَمَاعَةَ وَلَا الْجُمُعَةَ فَقَالَ
هَذَا فِي النَّارِ
رواہ الترمذی موقوفا کذا فی التزغیب و فی تنبیہ الفافلین روی عن مجاہد
ان رجلا جاء الى ابن عباس فقال يا ابن عباس ما تقول في رجل فذكره بلفظه زاد
في آخره فاختلف اليه شهرًا يسأل عن ذلك وهو يقول هو في النار.

⑤ ہضرات آابُدُللاہ ہبنہ آابواس (راہی:)کے اُک ہٹٹہ جہٹٹاسا
کرہل، اُک ہٹٹہ ساراہن رُہا راٹہ اہہ سارا راٹہ نفل ناماے
پڈہ، کٹٹ جُماا و جاماٹہ شہک ہئ نا-تاہار سہپکے ک ہلہن۔
تہن اُٹٹ کرہلہن، لاکٹہ آاللاہمہ۔ (تارگیب : تہرمہی)

فایدا : اُہی ہٹٹہ ہڈ اُکٹہ نہڈٹٹہ سہی ہرہٹٹ شاسٹہ ہاگ
کرہیا آاللاہمہ ہئٹہ مٹٹہ پاہہ، یہٹہ سہ ماسلمان۔ کٹٹ ناآانہ
کٹکال تاہاکہ آاللاہمہ پڈہیا ٹاکہتہ ہئہ۔ آاہل ٹُشہڈہر
مٹہ اُجہا اہہ نفلہر ہرہ جُہر دہٹا یای کٹٹ جاماٹہر ہرہ
تاہاڈہر کون ڈاکفہپ ناہ۔ ہہاکہی تاہارا بُیُگی مہنہ کرہ۔ اٹٹ
آاللاہر ماہبُہ نہہر انُسرہ کراہ ہئل آاسل بُیُگی۔ اُک ہادیسہ
ہرہت ہئییاہہ، تہن ہٹٹہر اُپر آاللاہ تاہالا لائنٹ ہرہن :
ہٹمٹ : اُہ ہٹٹہ یاہار اُپر مٹٹاڈہگہن یُٹٹسہگٹ کارہنہ ناراج
ٹاکا سٹہو سہ ہمامٹہ کرہ۔ دہیای اُہ نارہ یاہار اُپر تاہار سہامہ
ناراج۔ تہی اُہ ہٹٹہ یہ آایان شُنہیا جاماٹہ شہک ہئ نا۔

⑥ أَخْبَرَنَا ابْنُ مَرْوَةَ عَنْ كَعْبٍ
بِالْحُسْبِ قَالَ وَاللَّهِ لَأَنْزَلَ النَّبُوَّةَ عَلَى
مُوسَى وَإِلَّا يَجِئِلَ عَلَى عِيسَى وَالزُّكُورُ
عَلَى دَاوُدَ وَالْفُرْقَانِ عَلَى مُحَمَّدٍ إِنْ لَكَ
هَذِهِ الْآيَاتُ فِي الصَّلَاةِ الْكُتُوبَةِ
حَيْثُ يَأْتِي بِهِنَّ يَوْمَ يُكْتَفَى عَنْ
سَاقٍ إِلَى قَوْلِهِ وَهُمْ سَائِلُونَ الصَّلَاةَ
الْحُسْبُ إِذَا دُفِيَ بِهَا وَخُجِرَ إِلَيْهَا
فِي الشَّعْبِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ

حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ قسم ہے
اُس پاک ذات کی جس نے تورات حضرت
موسیٰ پر اور انجیل حضرت عیسیٰ پر اور زبور
حضرت داؤد پر علی نبینا وعلیکم الصلوٰۃ والسلام
نازل فرمائی اور قرآن شریف سیدنا محمد صلی اللہ
علیہ وسلم پر نازل فرمایا کہ یہ آیتیں فرض نمازوں
کو جماعت سے ایسی جگہ پڑھنے کے باوجود
جہاں اذان ہوتی ہو نازل ہوتی ہیں نیز جگہ جہاں
جس دن حق تعالیٰ شاء ساق کی تختی فرماتیں

الصلوات في الجماعات واخرج البيهقي
عن ابن عباس قال الرجل يسمع الاذان
فلا يجيب الصلوة كذا في الدر المنثور
قلت وتنام الآية يوم يكشف عن
ساقه ويدعون الى السجود فلا يستطيعون
خاشعة ابصارهم ترعقهم ذلة
وقد كانوا يدعون الى السجود
موساكينون ٥ (٣-٢)

গে (যে) এক খাস কিসম কী তজ্জী হুগী) অর লোক
অস দন সজদে কে লৈতে ব্লাতৈ জাদিস গে
তুওর লোক সজদে নহিস কর সিকিস গে. অُن কী
অ নকিস শরম কে লৈতে জঙ্কী হুগী হুগী
অর অন পুডলৈত স্জহাতী হুগী অসিলৈতৈ
কর লোক দন্যাস মিস সজদে কী طرف ব্লাতৈ
জাতৈ ত্বে অর মস্জ সাম তন্দর স্ত ত্বে
(পছর মিস সজদে নহিস করৈতৈ)

৬) হযরত কা'ব আহবার (রাযিঃ) বলিয়াছেন, সেই আল্লাহর কসম, যিনি হযরত মুসা (আঃ)-এর উপর তৌরাত, ঈসা (আঃ)-এর উপর ইঞ্জিল, দাউদ (আঃ)-এর উপর যবুর এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কুরআন শরীফ নাযিল করিয়াছেন—কুরআনের এই আয়াতসমূহ ফরজ নামাযগুলি জামাতের সহিত এমনই জায়গায় আদায় করার ব্যাপারে নাযিল হইয়াছে, যেখানে আযান হয়। (আয়াতসমূহের তরজমা :-) যেদিন আল্লাহ পাক ছাক—এর তাজাল্লী প্রকাশ করিবেন (যাহা এক বিশেষ ধরণের তাজাল্লী হইবে) এবং সকল মানুষকে সেজদার জন্য ডাকা হইবে, সেইদিন তাহারা সেজদা করিতে পারিবে না, তাহাদের চোখ লজ্জায় অবনত হইয়া থাকিবে, তাহাদের সর্বঙ্গে অপমান বিরাজ করিবে। কারণ তাহাদিগকে দুনিয়াতে সেজদার জন্য ডাকা হইত কিন্তু সুস্থ-সবল থাকা সত্ত্বেও সেজদা করিত না। (দুরে মানসূর)

ফায়দা : ছাক—এর তাজাল্লী এক বিশেষ ধরনের জ্যোতি যাহা হাশরের ময়দানে প্রকাশ হইবে। ইহা দেখিয়া সমস্ত মুসলমান সেজদায় লুটাইয়া পড়িবে। কিন্তু কিছু লোকের কোমর শক্ত হইয়া যাইবে ; ফলে তাহারা সেজদা করিতে পারিবে না। এই সমস্ত লোক কাহারা সেই সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে :- হযরত কা'ব আহবার (রাযিঃ) হইতে এক তাফসীর বর্ণিত হইয়াছে ; হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) প্রমুখও এই একইরূপ তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইহারা ঐ সমস্ত লোক যাহাদিগকে জামাতে নামায পড়ার জন্য ডাকা হইত, কিন্তু তাহারা জামাতে নামায পড়িত না।

দ্বিতীয় তাফসীর হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন, আমি হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট

শুনিয়াছি যে, ইহারা ঐ সমস্ত লোক যাহারা দুনিয়াতে লোক দেখানোর জন্য নামায পড়িত।

তৃতীয় তাফসীর মতে ইহারা কাফের, যাহারা দুনিয়াতে মোটেই নামায পড়িত না।

চতুর্থ তাফসীর অনুযায়ী ইহারা হইল মোনাফেক। (আল্লাহই অধিক জানেন এবং তাঁহার জ্ঞানই পূর্ণতম।)

হযরত কা'ব আহবার (রাযিঃ) কসম খাইয়া যে তাফসীর বর্ণনা করিলেন এবং ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) এর ন্যায় উচ্চ মর্তবার সাহাবী ও ইমামে তাফসীর যাহাকে সমর্থন করিলেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, ব্যাপারটি কত গুরুতর—হাশরের ময়দানে অপমানিত ও লজ্জিত হইতে হইবে এবং যেখানে সমগ্র মুসলমান সেজদায় মশগুল থাকিবে সেখানে তাহারা সেজদা করিতে পারিবে না!

উপরোক্ত বর্ণনাসমূহ ছাড়াও নামায তরক করা সম্পর্কে আরও বহু শাস্তি ও সতর্কবাণী বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃত মুসলমানের জন্য একটি সতর্কবাণীরও প্রয়োজন ছিল না ; কেননা আল্লাহ ও রাসুলের আদেশই তাহার জন্য যথেষ্ট। আর যাহাদের নিকট কদর নাই তাহাদের জন্য হাজার ধরণের ধমকও নিষ্ফল। যখন শাস্তির সময় আসিয়া যাইবে তখন লজ্জা ও অনুতাপ হইবে কিন্তু উহাতে কোন কাজ হইবে না।

তৃতীয় অধ্যায়

খুশু-খুজুর (একাগ্রতা) বর্ণনা

অনেক লোক এমন আছেন, যাহারা নামায পড়েন এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে এমনও আছেন যাহারা জামাআতের সহিত নামায পড়ারও এহতেমাম করিয়া থাকেন ; কিন্তু এতদসত্ত্বেও এরূপ খারাপভাবে পড়িয়া থাকেন যে, তাহা নেকী ও সওয়াবের বস্তু হওয়ার পরিবর্তে ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার কারণে মুখের উপর ছুড়িয়া মারা হয়—যদিও একেবারে নামায না পড়া হইতে এইরূপ মন্দভাবে পড়িয়া নেওয়াও উত্তম। কেননা, একেবারে নামায না পড়িলে যে আজাব ও শাস্তির কথা রহিয়াছে, তাহা খুবই মারাত্মক এবং খুবই কঠিন। মন্দভাবে নামায পড়ার কারণে যদিও উহা কবুল হওয়ার মত হইল না, মুখের উপর ছুড়িয়া মারা হইল এবং ইহাতে কোনরূপ সওয়াবও হইল না, কিন্তু নামায একেবারে না পড়িলে যে পর্যায়ের নাফরমানী ও অবাধ্যতা হইত তাহা তো অন্ততঃপক্ষে হইবে না। কিন্তু আসল কর্তব্য হইল এই যে, যখন মানুষ নামাযের জন্য সময় খরচ করে, কাজ-কারবার ছাড়িয়া রাখে, কষ্ট স্বীকার করে, তখন যাহাতে এই নামায বেশী হইতে বেশী সুন্দর, ওজনী ও মূল্যবান হয়, সেইজন্য চেষ্টা করা চাই ; ইহাতে কোন রকমের কমি করা চাই না। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিতেছেন—যদিও এই আয়াত কুরবানীর সহিত সম্পর্ক রাখে কিন্তু আল্লাহর হুকুম-আহকাম তো সবই এক। এরশাদ হইতেছে :

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَكِنْ يَنَالُ الشَّوْطَىٰ مِنْكُمْ

অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা নিকট কুরবানীর গোশতও পৌছে না এবং উহার রক্তও পৌছে না ; বরং তাহার নিকট পৌছিয়া থাকে তোমাদের পরহেজগারী ও এখলাস। (সূরা হজ্জ, আয়াত : ৩৭)

অতএব, যে পর্যায়ের এখলাস হইবে, সেই পর্যায়েই কবুল হইবে। হযরত মুআয (রাযিঃ) ফরমাইয়াছেন, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাকে ইয়ামানে পাঠাইয়াছিলেন, তখন আমি তাহার নিকট শেষ ওসিয়তের আবেদন করিলাম, হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, দ্বীনের প্রতিটি কাজে এখলাসের এহতেমাম করিবে, কেননা এখলাসের সহিত সামান্য আমলও অনেক বেশী।

হযরত সাওবান (রাযিঃ) বলেন, আমি হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে, এখলাসওয়ালারা সুখী হউক, কেননা তাহারা হেদায়াতের আলো, তাহাদের কারণেই অনেক বড় বড় ফেৎনা দূর হইয়া যায়। এক হাদীসে হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ তায়ালা কমজোর ও দুর্বল লোকদের বরকতে এই উম্মতের সাহায্য করিয়া থাকেন। তাহাদের দোয়া, তাহাদের নামায এবং তাহাদের এখলাসের ওসীলায় সাহায্য করিয়া থাকেন। (তারগীব) নামায সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন :

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَوِّقُونَ

অর্থাৎ, বড়ই ক্ষতি ও ধ্বংস রহিয়াছে ঐ সমস্ত লোকের, যাহারা নিজেদের নামায হইতে গাফেল রহিয়াছে। তাহারা এমন যে, (নামাযের মধ্যে) রিয়াকারী করিয়া থাকে। (সূরা মাউন, আয়াত : ৪-৬)

‘গাফেল থাকার’ বিভিন্ন তফসীর করা হইয়াছে। তন্মধ্যে এক তফসীর এই যে, ওয়াক্তের কোন খবর রাখে না ; নামায কাজ করিয়া ফেলে। দ্বিতীয় তফসীর এই যে, নামাযের প্রতি মনোযোগী হয় না ; এদিক সেদিক মশগুল হইয়া থাকে। তৃতীয় তফসীর এই যে, এই খবর রাখে না যে, কত রাকআত নামায পড়া হইল।

অন্য এক আয়াতে মুনাফেকদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ হইতেছে :

وَلَا تَأْمُرُوا إِلَى الْمَعْلُومِ قَامُوا كَالْيَهُودِ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

অর্থাৎ, এবং যখন তাহারা নামাযের জন্য দাঁড়ায়, তখন অত্যন্ত অলসভাবে দাঁড়ায়, কেবল লোকদিগকে দেখাইয়া থাকে (যে আমরাও নামাযী), তাহারা আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে না ; কিন্তু অতি অল্প।

(সূরা নিসা, আয়াত : ১৪২)

অন্য এক আয়াতে কয়েকজন নবী আলাইহিমুস-সালামের কথা উল্লেখ করিয়া এরশাদ করিতেছেন :

تَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَصَاعُوا الْمَلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّيْطَانَ فَكَفَرُوا

অর্থাৎ, এই সকল নবীদের পর এমন কিছু অযোগ্য লোক পয়দা হইয়াছে, যাহারা নামাযকে বরবাদ করিয়া দিয়াছে এবং খাহেশাতের অনুসরণ করিয়াছে। অতএব তাহারা শীঘ্রই আখেরাতে চরম ধ্বংসের সম্মুখীন হইবে। (সূরা মারযাম, আয়াত : ৫৯)

‘গাই’ শব্দের আভিধানিক অর্থ হইল, গোমরাহী, পথভ্রষ্টতা। ইহার দ্বারা উদ্দেশ্য হইল আখেরাতের বরবাদী ও ধ্বংস। অনেক তফসীরকার লিখিয়াছেন যে, ‘গাই’ জাহান্নামের একটি স্তর, যেখানে রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি জমা হইবে এবং উহার মধ্যে এই সমস্ত লোককে নিক্ষেপ করা হইবে।

অন্য এক আয়াতে এরশাদ হইতেছে :

وَمَا مِنْهُمْ أَنْ تَقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا اللَّهُ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا هُمْ كَسَالَى وَلَا يَنْفِقُونَ إِلَّا هُمْ كَارِهُونَ ۝

অর্থাৎ, তাহাদের দান-খয়রাত কবুল না হওয়ার পথে একমাত্র বাধা হইল এই যে, তাহারা আল্লাহর সহিত এবং তাঁহার রাসূলের সহিত কুফর করিয়াছে, নামায পড়িলেও অলসতার সহিত পড়িয়াছে এবং দান করিলেও অনিচ্ছা ও অসন্তোষের সহিত করিয়াছে।

(সূরা তওবা, আয়াত : ৫৪)

অপরদিকে উত্তমরূপে নামায আদায়কারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিতেছেন :

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

অর্থাৎ, নিশ্চয় এসকল মুমিন সফলকাম হইয়াছে, যাহারা বিনয় ও খুশু সহকারে নামায আদায় করে, বেহুদা কাজ হইতে নিজেদেরকে ফিরাইয়া রাখে, যাকাত প্রদান করে (অথবা নিজেদের চরিত্রকে সংশোধন করে), নিজেদের স্ত্রী এবং দাসীদের ছাড়া অন্যদের হইতে আপন লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে—কেননা, এই ক্ষেত্রে কোন দোষ নাই ; তবে যাহারা ইহা ব্যতীত অন্য স্থানে যৌন-খাহেশ পূরা করে, তাহারা অবশ্যই সীমালংঘনকারী। যাহারা আমানত ও অঙ্গীকারের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখে এবং যাহারা নিজ নামাযের এহতেমাম করে—একমাত্র তাহারাই জাহান্নাম-ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী। সেখানে তাহারা চিরকাল থাকিবে।

(সূরা মু’মিনুন, আয়াত : ১-১১)

হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, ফেরদাউস জাহান্নামের সর্বোন্নত ও সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। সেখান হইতে জাহান্নামের নহরসমূহ প্রবাহিত হয় ; ইহারই উপর আল্লাহ তায়ালা আরশ হইবে। তোমরা যখন জাহান্নামের জন্য দোয়া কর তখন জাহান্নাম তুল ফেরদাউসের জন্য দোয়া করিও।

অন্য এক আয়াতে নামায সম্পর্কে এরশাদ হইতেছে :

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْخَالِفِينَ ۝ الَّذِينَ يُطَوِّنُونَ أَنْفُسَهُمْ لِقَارِبِهِمْ وَإِنَّهُمْ لَكَاثِبُونَ

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই নামায বড় কঠিন, তবে যাহাদের অন্তরে (আল্লাহর প্রতি) খুশু আছে, তাহাদের জন্য মোটেই কঠিন নহে। ইহারা ঐ সকল লোক যাহারা এই কথা খেয়াল রাখে যে, নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন তাহারা নিজেদের রবের সহিত মিলিত হইবে এবং মৃত্যুর পর তাঁহারই দিকে ফিরিয়া যাইবে। (সূরা বাকারাহ, আয়াত : ৪৫/৪৬)

এই সকল লোকের প্রশংসা করিয়া আল্লাহ তায়ালা এক আয়াতে এরশাদ করিয়াছেন :

فِي بُيُوتٍ إِذْنُ اللَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْعُدْوَةِ الْوُحْدَةِ ۝ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ۝ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يُحَاوِنُونَ ۝ يَوْمًا تَقَلُّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝ لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَكْثَرَ مَا عَمِلُوا ۝ وَبِزِيدٍ هُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۝ وَاللَّهُ يَزِدُّ مَنْ يُشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থাৎ, যে সকল ঘরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে এবং উহাতে যিকির করিতে আল্লাহ পাক হুকুম করিয়াছেন, সেই সকল ঘরে এমন সব লোক সকাল-সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠ করে, যাহাদিগকে ব্যবসা-বাণিজ্য, যেচাকেনা আল্লাহর যিকির, নামায কায়ম করা এবং যাকাত প্রদান করা হইতে গাফেল করিতে পারে না। তাহারা এমন এক দিনকে ভয় করে, যেদিন অন্তর ও চক্ষুসমূহ উলট-পালট হইয়া যাইবে (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) এবং তাহারা এইসব এইজন্যই করিতেছে যেন আল্লাহ তায়ালা তাহাদের নেক আমলের বদলা দান করেন ; বরং আপন করুণায় বদলা হইতেও আরও অনেক বেশী তাহাদিগকে দান করেন ; আর আল্লাহ তায়ালা তো যাহাকে ইচ্ছা অগণিত দান করিয়া থাকেন।

(সূরা নূর, আয়াত : ৩৬-৩৯)

تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لئے
در تری رحمت کے میں ہر دم کئے

অর্থাৎ, তুমি এমন দাতা যে, দেওয়ার জন্য তোমার অনুগ্রহের দরজা সदा উন্মুক্ত থাকে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, নামায কায়েম করার অর্থ হইল, উহার রুকু ও সেজদা সঠিকভাবে আদায় করে, পুরাপুরি আল্লাহর দিকে রুজু থাকে এবং অত্যন্ত খুশি সহকারে নামায পড়ে।

হযরত কাতাদাহ (রাযিঃ) হইতেও এই কথা নকল করা হইয়াছে যে, নামায কায়েম করার অর্থ হইল—নামাযের ওয়াক্তসমূহের হেফাজত করা এবং ওযু, রুকু ও সেজদাকে উত্তমরূপে আদায় করা—অর্থাৎ, পবিত্র কুরআনের যে সমস্ত জায়গায় ‘আকামাস-সালাতা’ এবং ‘ইউকীমূনাস-সালাতা’ বলা হইয়াছে, সেই সমস্ত জায়গায় এই অর্থকেই উদ্দেশ্য করা হইয়াছে। (দুররে মানসূর) বস্তুতঃ ইহারাই হইল ঐ সমস্ত লোক, যাহাদের প্রসঙ্গে অন্য এক আয়াতে এইভাবে বলা হইয়াছে :

عِبَادَ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَى الْأَرْضِ مَوَاقِدًا خَاطِبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا
سَلَامًا وَالَّذِينَ يَسْتَنْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُبْحًا وَاقِيًا مَلًا

অর্থাৎ, পরম দয়ালু আল্লাহ তায়ালা খাছ বান্দা হইল তাহারা, যাহারা যমীনের উপর বিনয়ের সহিত চলে (অর্থাৎ অহংকারের সহিত চলাফেরা করে না) যখন তাহাদের সহিত জাহেল লোকেরা (মুখের মত) কথাবার্তা বলে, তখন তাহারা বলে—সালাম। (অর্থাৎ তাহারা শান্তির কথা বলে যাহাতে অশান্তি দূর হয়, অথবা দূর হইতে তাহারা সালাম বলিয়াই ক্ষান্ত হয়) এবং ইহারাই ঐ সমস্ত লোক যাহারা রাতভর আপন রবের উদ্দেশ্যে সেজদা এবং নামাযে দণ্ডায়মান থাকিয়া কাটাইয়া দেয়।”

(সূরা ফোরকান, আয়াত : ৬৩/৬৪)

অতঃপর তাহাদের আরও কতিপয় গুণের উল্লেখ করিয়া এরশাদ ফরমান :

الَّذِينَ يَجُودُونَ الْعُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيَقُولُونَ فِيمَا تَجَعَلَتْ وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا
سُبْحًا وَاقِيًا مَلًا

অর্থাৎ, এই সকল লোককে তাহাদের ধৈর্যের (অথবা দ্বীনের উপর অটল থাকার) বদলাস্বরূপ বেহেশতের বালাখানাসমূহ দান করা হইবে এবং সেখানে তাহাদিগকে ফেরেশতাদের তরফ হইতে দোয়া ও সালাম দ্বারা স্বাগত জানানো হইবে। তাহারা চিরকাল সেখানে অবস্থান করিবে। তাহা কতই না উত্তম ঠিকানা ও আবাসস্থল। (সূরা ফোরকান, আঃ ৭৫/৭৬)

অন্য এক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে :

وَالسَّالِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۚ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۚ بِمَا صَبَرْتُمْ
فَبْنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۚ ۝ ৭৮

অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ তাহাদের নিকট প্রত্যেক দরজা দিয়া প্রবেশ করিবে এবং তাহাদিগকে বলিবে, তোমাদের উপর সালাম (শান্তি)—কেননা তোমরা দ্বীনের উপর অটল থাকিয়া ধৈর্য ধারণ করিয়াছ। অতএব, কতই না চমৎকার শেষ আবাসস্থল। (সূরা রায়াদ, আয়াত : ২৩-২৪)

তাহাদের প্রশংসায় অন্য এক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে :

تَجَاوَى جُؤَيْمَهُ عَنِ الْمَصَاجِعِ يَذْعُونُ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا
أَرْزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ ۚ فَكَذَلِكَ نَقُصُّ مَا آخِزْنَاهُ لَكُمْ مِنْ قُرْآنٍ عَمِيٍّ جَزَاءً
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থাৎ, তাহারা এমন লোক, যাহাদের পার্শ্বদেশ আরামের বিহানা হইতে পৃথক থাকে, (অর্থাৎ তাহারা নামাযে মগ্ন থাকে) আপন রবকে আজাবের ভয় ও সওয়াবের আশায় ডাকিতে থাকে এবং তাহারা আমার দেওয়া নেয়ামত হইতে খরচ করিয়া থাকে। এইসব লোকের জন্য অদৃশ্য জগতে তাহাদের চক্ষু শীতল করার মত কি কি পুরস্কার মওজুদ রহিয়াছে ; তাহা কেহই জানে না। যাহা তাহাদের নেক আমলের বদলা স্বরূপ হইবে। (সূরা আলিফ, লাম, মীম সেজদা, আয়াত : ১৬-১৭)

তাহাদের শানে আরও এরশাদ হইয়াছে :

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُودٍ اخْذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ
ذَلِكَ مُحْضِينَ ۚ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مِنَ الْبَيْتِ مَا يَنْجَعُونَ
وَبِالْإِسْحَارِ لَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۚ ۝ ১৮

অর্থাৎ, নিশ্চয় মুত্তাকীগণ বেহেশতের বাগান ও বর্ণাসমূহের মধ্যে অবস্থান করিবে। আপন পরওয়ারদিগারের দানকে তাহারা আনন্দচিহ্নে গ্রহণ করিতে থাকিবে। নিশ্চয় তাহারা ইতিপূর্বে (দুনিয়াতে) নেক আমলকারী ছিল, রাতে তাহারা খুব কমই নিদ্রা যাইত, শেষ রাতে উঠিয়া তাহারা এস্তেগফার ও ক্ষমা-প্রার্থনা করিত। (সূরা জারিয়াত, আয়াত : ১৫-১৮)

অন্য এক আয়াতে এরশাদ হইয়াছে :

أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ ۚ أَنَاءَ الْبَيْتِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَخْضَعُ لِآخِرَةٍ وَيَرْجُوَ رَحْمَةَ رَبِّهِ ۚ
قُلْ مَنْ يَسْتَوِ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ۚ ۝ ১৯

যাহারা বে-দ্বীন তাহাদের সহিত কি ঐ সমস্ত লোকের তুলনা হইতে পারে, যাহারা রাত্রিতে কখনও সেজদায় পড়িয়া থাকে আবার কখনও নিয়ত বাঁধিয়া (আল্লাহর এবাদতে) দাঁড়াইয়া থাকে। আখেরাতকে ভয় করে

এবং স্বীয় পরওয়ারদিগারের রহমতের আশা পোষণ করে। (আপনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন) যাহারা জানে আর যাহারা জানে না—এই দুই শ্রেণী কি কখনও সমান হইতে পারে? (আর ইহা নিতান্তই স্পষ্ট বিষয় যে, যাহারা জানে তাহারা আপন রবের এবাদত করিবেই; আর যাহারা এমন দয়ালু মাওলার এবাদত করে না তাহারা শুধু অজ্ঞ নয় বরং অজ্ঞ হইতেও অজ্ঞ।) বস্তুতঃ উপদেশ গ্রহণ করে একমাত্র বুদ্ধিমান ব্যক্তিরাই।

(সূরা যুমার, আয়াত : ৯)

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে :

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَكُومًا إِذْ أَمَسَهُ الشُّرُجُوعُ عَلَيْهِ إِذْ أَمَسَهُ الْخَيْرُ مُنْوَماً إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَأِئُومُونَ

অর্থাৎ, নিশ্চয় মানুষকে অস্থির চিত্তরূপে সৃষ্টি করা হইয়াছে। কোনরূপ বিপদে পড়িলেই সে অতিমাত্রায় হাহুতাশ আরম্ভ করে, আর যখন সে কোনরূপ কল্যাণ লাভ করে তখন সে কৃপণতা শুরু করে (যাহাতে আর কেহ এই কল্যাণ লাভ করিতে না পারে)। তবে ঐসব নামাযী লোকদের ব্যাপার স্বতন্ত্র যাহারা পাবন্দী ও স্থিরতার সহিত নামায আদায় করে।

(সূরা মায়ারিজ, আয়াত : ১৯-২৩)

এই আয়াতের পর আল্লাহ তায়ালা তাহাদের আরও কতিপয় গুণ বর্ণনা করার পর এরশাদ করিয়াছেন :

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يَحْفَظُونَ وَالَّذِينَ فِي جَنَّتِ مُكْرَمُونَ

অর্থাৎ, আর যাহারা নিজেদের নামাযসমূহের হেফাজত করে তাহারাই ঐ সকল লোক যাহাদিগকে বেহেশতে সম্মানিত করা হইবে।

(সূরা মায়ারিজ, আয়াত : ৩৪-৩৫)

উপরোক্ত আয়াতসমূহ ছাড়া আরও অনেক আয়াতে নামাযের হুকুম এবং নামাযীদের ফযীলত সম্মান ও পুরস্কারের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে নামায এইরূপ দৌলতই বটে। এই কারণেই সরদারে দোজাহান, ফখরে রুসুল হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার চোখের শীতলতা নামাযের মধ্যে রহিয়াছে। এই কারণেই হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) দোয়া করিতেন :

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَافِعًا وَتَقَبَّلْ دُعَائِي

অর্থাৎ, হে পরওয়ারদিগার, আমাকে বিশেষ এহতেমামের সহিত নামায আদায়কারী বানাইয়া দাও এবং আমার বংশধরের মধ্যেও এমন

লোক পয়দা কর, যাহারা নামাযের এহতেমাম করিবে। হে পরওয়ারদিগার, আমার এই দোয়া কবুল কর। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ৪০) আল্লাহর প্রিয় নবী হযরত ইবরাহীম (আঃ) 'খলীল' উপাধিতে গৌরবান্বিত হওয়া সত্ত্বেও নামাযের পাবন্দী ও এহতেমামের ব্যাপারে তাহারই নিকট প্রার্থনা করিতেছেন।

স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা আপন প্রিয় হাবীব সাইয়িদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হুকুম করিতেছেন :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا وَنَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (سورة طه - ১৩৮)

অর্থাৎ, আপনি আপনার পরিবার-পরিজনকে নামাযের জন্য হুকুম করিতে থাকুন এবং নিজেও উহার এহতেমাম করিতে থাকুন। আপনার দ্বারা আমি রুজি (উপার্জন) চাই না; রিযিক তো আমিই আপনাকে দিব। উত্তম পরিণাম একমাত্র পরহেজগারীর মধ্যেই নিহিত। (সূরা ত্বাহ, আঃ ১৩২)

হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন অভাব অনটন ইত্যাদি দেখা দিত, তখন তিনি পরিবারের সকলকে নামাযের আদেশ করিতেন এবং উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করিতেন।

পূর্ববর্তী আশ্বিয়া আলাইহিমুস সালামেরও এই একই রীতি ছিল—যখনই তাহারা কোন সমস্যার সম্মুখীন হইতেন তখনই তাহারা নামাযে মশগুল হইয়া যাইতেন। কিন্তু আমরা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল সম্পর্কে এত গাফেল ও বেপরওয়া যে, ইসলাম ও মুসলমানীর লম্বা-চওড়া দাবী করা সত্ত্বেও ইহার প্রতি মনোযোগী হই না। বরং যদি কেহ নামাযের কথা বলে বা নামাযের দিকে দাওয়াত দেয়, তবে তাহার সহিত ঠাট্টা করিয়া থাকি এবং তাহার বিরোধিতা করিয়া থাকি। কিন্তু ইহাতে কাহার কি ক্ষতি হইল? বরং নিজেরই ক্ষতি হইল।

অপরদিকে যাহারা নামায পড়ে, তাহাদের মধ্যেও অনেকেই এমনভাবে নামায পড়ে যে, ইহাকে যদি নামাযের সাথে তামাশা করা বলা হয়, তবে অতৃপ্তি হইবে না। কেননা, নামাযের খুশু-খুজু তো দূরের কথা অনেকেই নামাযের অবশ্য করণীয় রুকনও পুরাপুরিভাবে আদায় করে না। অথচ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নমুনা আমাদের সামনে রহিয়াছে—তিনি নিজে প্রতিটি কাজ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)—এর আমলও আমাদের সামনে রহিয়াছে—

তাঁহাদের অনুসরণ করা উচিত।

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর কিছু ঘটনা নমুনাস্বরূপ আমার রচিত 'হেফায়াতে সাহাবাহ' কিতাবে লিখিয়াছি, এখানে আর লেখার প্রয়োজন নাই। তবে এই কিতাবে সূফিয়ায়ে কেরামের কিছু ঘটনা নকল করার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হাদীস নকল করিতেছি।

শায়েখ আবদুল ওয়াহেদ (রহঃ) বিখ্যাত সুফীগণের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি বলেন, একবার আমার ঘুমের এত চাপ হইল যে, রাত্রের নিয়মিত ওজীফাগুলিও ছুটিয়া গেল। তখন আমি স্বপ্নে দেখিলাম, অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতী সবুজ রেশমী পোশাক পরিহিতা। যাহার পায়ের জুতাগুলি পর্যন্ত তসবীহ পাঠে মশগুল রহিয়াছে। সে আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছে, আমাকে পাওয়ার জন্য তুমি চেষ্টা কর, আমি তোমাকে পাওয়ার চেষ্টা করিতেছি। এই কথা বলিয়া সে কতকগুলি প্রেমের কবিতা পাঠ করিল। এই স্বপ্ন দেখিয়া আমি জাগিয়া গেলাম এবং কসম করিলাম যে, আমি রাত্রে আর কখনও ঘুমািব না। বর্ণিত আছে, দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তিনি এশার ওয়ূ দ্বারা ফজরের নামায পড়িয়াছেন। (নুহহাহ)

শায়েখ মাজহার সা'দী (রহঃ) একজন বুয়ুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আল্লাহ তায়ালায় ইশক ও মহব্বতে দীর্ঘ ষাট বছর কালাকাটি করিয়াছেন। এক রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, খাঁটি মেশকে পরিপূর্ণ একটি নহর। উহার কিনারায় মুক্তার গাছগুলিতে স্বর্ণের শাখাসমূহ বাতাসে দুলিতেছে। সেখানে অল্প বয়সের কয়েকটি কিশোরী উচ্চস্বরে তাসবীহ পাঠে মগ্ন রহিয়াছে। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহারা? উত্তরে তাহারা কবিতার দুইটি চরণ পাঠ করিল, যাহার অর্থ হইল—আমাদিগকে মানুষের মাবুদ ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরওয়ারদিগার ঐসব লোকের জন্য পয়দা করিয়াছেন, যাহারা রাত্রে আপন প্রতিপালকের সামনে নামাযে দুই পায়ের উপর দাঁড়াইয়া থাকেন এবং আল্লাহর দরবারে দোয়া ও মোনাজাতে মশগুল থাকেন।

হযরত আবু বকর যারীর (রহঃ) বলেন, আমার নিকট একজন নওজোয়ান গোলাম থাকিত। সারাদিন সে রোযা রাখিত এবং সারা রাত্র তাহাজ্জুদ নামায পড়িত। একদা আমার নিকট আসিয়া সে বলিল, ঘটনাক্রমে আজ রাত্রে আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। স্বপ্নে দেখিলাম, মেহরাবের দেওয়াল ফাটিয়া গিয়াছে, উহা হইতে কয়েকটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে বাহির হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে একজন ছিল খুবই

কুৎসিত। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা কাহারা আর এই কুৎসিত মেয়েলোকটিই বা কে? তাহারা বলিতে লাগিল, আমরা হইলাম আপনার বিগত রাত্রিসমূহ আর এই মেয়েলোকটি হইল আপনার আজকের রাত্রি। (নুহহাহ)

জনৈক বুয়ুর্গ বলেন, এক রাত্রে আমার এত গভীর ঘুম আসিল যে, আমি ঘুম হইতে জাগিতে পারিলাম না। আমি স্বপ্নে এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়েকে দেখিলাম। এমন সুন্দরী মেয়ে আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। তাহার দেহ হইতে তীব্র সুগন্ধি ছড়াইয়া পড়িতেছিল। এমন সুগন্ধি আমি জীবনে কখনও অনুভব করি নাই। সে আমাকে একটি কাগজের টুকরা দিল, উহাতে কবিতার তিনটি চরণ লিখা ছিল : তুমি নিদ্রার স্বাদে বিভোর হইয়া বেহেশতের বালাখানাসমূহকে ভুলিয়া গিয়াছ, যেখানে তোমাকে চিরকাল থাকিতে হইবে, সেখানে কখনও মৃত্যু আসিবে না। তুমি ঘুম হইতে উঠ, তাহাজ্জুদ নামাযে কুরআন তেলাওয়াত করা ঘুম হইতে অনেক উত্তম। তিনি বলেন, এই ঘটনার পর হইতে যখনই আমার ঘুম আসে এই কবিতাগুলি স্মরণ হইয়া যায় এবং আমার ঘুম একেবারে দূর হইয়া যায়।

হযরত আতা (রহঃ) বলেন, আমি এক বাজারে গেলাম, সেখানে একটি বাঁদী বিক্রয় হইতেছিল। বাঁদীটিকে পাগল বলা হইতেছিল। আমি সাত দীনার দিয়া তাহাকে খরিদ করিয়া আমার ঘরে লইয়া আসিলাম। যখন রাত্রের কিছু অংশ অতিবাহিত হইল, তখন দেখিলাম, সে উঠিয়া ওয়ূ করিল এবং নামায শুরু করিয়া দিল। নামাযের মধ্যে তাহার অবস্থা এমন হইতেছিল যে, কাঁদিতে কাঁদিতে যেন তাহার দম বাহির হইয়া যাইবে। নামাযের পর সে মোনাজাত শুরু করিল এবং বলিতে লাগিল, হে আমার মাবুদ, তুমি আমাকে যে মহব্বত কর—সেই মহব্বতের কসম, তুমি আমার উপর রহম কর। আমি তাহাকে বলিলাম, এইরূপ বলিও না ; বরং এরূপ বল যে, আমি তোমাকে যে মহব্বত করি—সেই মহব্বতের কসম। আমার এই কথা শুনিয়া সে রাগান্বিত হইয়া গেল এবং বলিতে লাগিল, আল্লাহর কসম, তিনি যদি আমাকে মহব্বত না করিতেন, তবে তোমাকে মধুর নিদ্রায় বিভোর করিয়া আমাকে এইভাবে নামাযে দাঁড় করাইয়া রাখিতেন না। ইহা বলিয়া সে উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল এবং কয়েকটি কবিতার পংক্তি আবৃত্তি করিল। যাহার অর্থ হইল : অস্থিরতা বৃদ্ধি পাইতেছে, অন্তর পুড়িয়া যাইতেছে, ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে। প্রেমের জ্বালায় যে অস্থির সে কিভাবে স্থির হইতে

পারে? আয় আল্লাহ, যদি আনন্দদায়ক কিছু থাকে, তবে তাহা দান করিয়া আমার প্রতি দয়া কর। অতঃপর সে উচ্চস্বরে এই দোয়া করিল, আয় আল্লাহ, তোমার সহিত আমার এই নিবিড় সম্পর্ক এতদিন গোপন ছিল; কেহই তাহা জানিত না। এখন মানুষের মধ্যে তাহা প্রকাশ হইয়া গিয়াছে, এই মুহূর্তে তুমি আমাকে উঠাইয়া লও। এই কথা বলিয়া সজোরে সে একটি চীৎকার দিল এবং মরিয়া গেল।

এই ধরনেরই একটি ঘটনা হযরত সিররী (রহঃ)এর সঙ্গেও ঘটিয়াছিল। তিনি বলেন, আমি আমার খেদমতের জন্য একটি বাঁদী খরিদ করিয়াছিলাম। নিজের অবস্থা গোপন রাখিয়া সে কিছুদিন আমার খেদমত করিতে থাকিল। নামাযের জন্য তাহার একটি জায়গা নির্দিষ্ট ছিল; যখনই সে কাজকর্ম হইতে অবসর হইয়া যাইত, তখন সে সেখানে যাইয়া নামাযে মশগুল হইয়া যাইত। এক রাতে আমি তাহাকে দেখিলাম—কিছুসময় সে নামায পড়ে আবার কিছু সময় মোনাজাতে মশগুল হইয়া থাকে। মোনাজাতে সে বলে যে, হে আল্লাহ, তোমার যে মহব্বত আমার সাথে রহিয়াছে, উহার ওসীলায় তুমি আমার অমুক অমুক কাজ করিয়া দাও। আমি তাহাকে উচ্চস্বরে বলিলাম, হে মহিলা, তুমি এইরূপ বল যে, তোমার সাথে আমার যে মহব্বত রহিয়াছে উহার ওসীলায়। এই কথা শুনিয়া সে বলিতে লাগিল, হে মনিব, আমার প্রতি যদি তাহার মহব্বত না থাকিত, তাহা হইলে তিনি আপনাকে নামায হইতে দূরে রাখিয়া আমাকে নামাযের জন্য দাঁড় করাইয়া রাখিতেন না। সিররী (রহঃ) বলেন, যখন সকাল হইল তখন আমি তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, তুমি আমার খেদমতের উপযুক্ত নও; তুমি শুধুমাত্র আল্লাহরই এবাদতের উপযুক্ত। অতঃপর কিছু সামান্য দিয়া আমি তাহাকে আযাদ করিয়া দিলাম।

(নুযহা)

হযরত সিররী সাক্তী (রহঃ) একজন স্ত্রীলোকের অবস্থান বর্ণনা করেন : যখন সে তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য দাঁড়াইত, তখন বলিত, হে আল্লাহ, ইবলীসও তোমার বান্দা; তাহার লাগাম তোমারই হাতে, সে আমাকে দেখে কিন্তু আমি তাহাকে দেখিতে পাই না। তুমি তাহার সকল কাজের উপর ক্ষমতা রাখ, কিন্তু সে তোমার কোন কাজের উপর ক্ষমতা রাখে না। হে আল্লাহ, সে আমার কোন ক্ষতি করিতে চাহিলে তুমি তাহা দূর করিয়া দাও, সে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিলে তুমি সেই চক্রান্তের প্রতিশোধ নাও। তাহার ক্ষতি হইতে আমি তোমার আশ্রয় চাহিতেছি এবং তোমারই সাহায্যে আমি তাহাকে বিতাড়িত করিতেছি। এই মোনাজাত

করিয়া সে কাঁদিতে থাকিত। এমনকি কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গেল। লোকেরা তাহাকে বলিল, দেখ; আল্লাহকে ভয় কর, তোমার দ্বিতীয় চক্ষুটিও না আবার নষ্ট হইয়া যায়। সে বলিল, আমার এই চক্ষু যদি জালাতের উপযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আল্লাহ তায়ালা আমাকে ইহা অপেক্ষা উত্তম চক্ষু দান করিবেন, আর যদি ইহা দোষখের উপযুক্ত হয়, তবে উহা নষ্ট হইয়া যাওয়াই ভাল।

শায়খ আবু আবদিল্লাহ জালা (রহঃ) বলেন, একদিন আমার আশ্মা আমার আববাজানকে মাছ আনিতে বলিলেন। আববাজান আমাকে লইয়া বাজারে রওনা হইলেন। আমরা বাজার হইতে মাছ খরিদ করিলাম। মাছটি ঘর পর্যন্ত পৌছানোর জন্য আমরা একজন কুলি তালাশ করিতেছিলাম। একজন নওজওয়ান ছেলে সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল; সে বলিতে লাগিল, চাচাজান, মনে হয় মাছটি বহন করার জন্য আপনি কুলি তালাশ করিতেছেন? আব্বা বলিলেন, হাঁ। ছেলেটি মাছের বোঝা মাথায় উঠাইয়া আমাদের সাথে চলিতে লাগিল। পথে সে আযানের আওয়াজ শুনিতে পাইল। সে বলিতে লাগিল, আল্লাহর ডাক আসিয়া গিয়াছে, আমাকে ওযুও করিতে হইবে। আমি নামাযের পর পৌছাইয়া দিতে পারিব। এখন আপনারা চিন্তা করিয়া দেখুন—ইচ্ছা হয় অপেক্ষা করুন কিংবা আপনাদের মাছ আপনারা লইয়া যান। এই কথা বলিয়া সে মাছ রাখিয়া মসজিদে চলিয়া গেল। আমার আব্বা ভাবিলেন—এই গরীব ছেলেটি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করিতেছে; আমাদের তো আরও বেশী করা উচিত। ইহা ভাবিয়া মাছ রাখিয়া আমরাও মসজিদে চলিয়া গেলাম। নামাযের পর আমরা ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, মাছ সেইভাবেই পড়িয়া রহিয়াছে। ছেলেটি উহা মাথায় লইয়া আমাদের বাড়ীতে পৌছাইয়া দিল। ঘরে পৌছিয়া আববাজান এই আশ্চর্য ঘটনা আমার আশ্মাকে শুনাইলেন। আশ্মা বলিলেন, ছেলেটিকে মাছ খাওয়ার জন্য রাখিয়া দাও। তাহাকে এই কথা জানাইলে সে বলিল, আমি তো রোযা রাখিয়াছি। আববাজান তাহাকে সন্ধ্যার সময় এখানে আসিয়া ইফতার করিতে অনুরোধ করিলেন। সে বলিল, আমি একবার চলিয়া গেলে দ্বিতীয়বার আসি না। হাঁ ইহা হইতে পারে যে, আমি নিকটেই কোন মসজিদে অবস্থান করিব, সন্ধ্যায় আপনার দাওয়াত খাইয়া চলিয়া যাইব। এই কথা বলিয়া নিকটেই এক মসজিদে সে চলিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় মাগরিবের পর সে আসিল এবং খানা খাইল। আমরা তাহাকে একটি নির্জন জায়গা দেখাইয়া দিলাম, সে সেখানে বিশ্রাম করিতে লাগিল। আমাদের পাশেই একজন পঙ্গু মহিলা

থাকিত। আমরা দেখিলাম সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া হাঁটিয়া আসিতেছে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কিভাবে সুস্থ হইলে? সে বলিল, আমি এই মেহমানের ওসীলা দিয়া দোয়া করিয়াছি, হে আল্লাহ, আমাকে তাহার বরকতে সুস্থ করিয়া দিন। সাথে সাথে আমি সুস্থ হইয়া গিয়াছি। এই ঘটনা শুনিয়া আমরা তাহাকে দেখিবার জন্য সেই নির্জন স্থানটিতে গেলাম। কিন্তু সেখানে গিয়া দেখি দরজা বন্ধ এবং ছেলেটির কোন চিহ্নও নাই।

এক বুযুর্গের ঘটনা আছে যে, তাঁহার পায়ে একটি ফোঁড়া দেখা দিয়াছিল। ডাক্তারগণ পরামর্শ দিল—যদি পা কাটিয়া না ফেলা হয়, তবে তাহার জীবননাশের আশংকা রহিয়াছে। এই কথা শুনিয়া তাঁহার মা বলিলেন, আপনারা এখন বিরত থাকুন; যখন সে নামাযে দাঁড়াইবে তখন কাটিয়া নিবেন। সুতরাং এইরূপই করা হইল—তিনি মোটেও টের পাইলেন না।

আবু আমের (রহঃ) বলেন, একদা আমি একটি খুব ক্ষীণ ও দুর্বল বাঁদীকে দেখিলাম—বাজারে খুব কম দামে বিক্রয় হইতেছে। তাহার পেট কোমরের সহিত লাগিয়া গিয়াছিল। মাথার চুলও এলোমেলো অবস্থায় ছিল। তাহাকে দেখিয়া আমার খুবই দয়া হইল, তাই আমি তাহাকে খরিদ করিয়া নিলাম। একদিন আমি তাহাকে বলিলাম, আমার সঙ্গে বাজারে চল, রমযানের জন্য কিছু জিনিসপত্র কিনিতে হইবে। সে বলিতে লাগিল, আল্লাহ পাকের শোকর, যিনি বছরের সবগুলি মাস আমার জন্য একই রকম করিয়া দিয়াছেন। সে দিনভর রোযা রাখিত এবং রাতভর নামায পড়িত। যখন ঈদের দিন নিকটবর্তী হইল, তখন আমি তাহাকে বলিলাম, আগামীকাল সকালে বাজারে যাইব তুমিও আমার সাথে যাইবে—ঈদের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনিতে হইবে। সে বলিতে লাগিল, হে আমার মনিব! আপনি তো দুনিয়াদারীতে খুবই মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। এই কথা বলিয়া সে ঘরে প্রবেশ করিয়া নামাযে মশগুল হইয়া গেল এবং অত্যন্ত মনোযোগের সহিত ধীরস্থিরভাবে এক একটি আয়াত স্বাদ লইয়া লইয়া পড়িতে লাগিল। এইভাবে যখন এই আয়াতে পৌঁছিল :

وَسُقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ الْآيَةِ অর্থঃ জাহান্নামে পুঁজ মিশ্রিত পানি পান করানো হইবে। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ১৬)

তখন সে এই আয়াতকে বারবার পড়িতে লাগিল এবং একটি বিকট চিৎকার দিয়া এই দুনিয়া হইতে বিদায় হইয়া গেল।

একজন সৈয়দ সাহেবের ঘটনা আছে যে, বার দিন পর্যন্ত তিনি একই ওযু দ্বারা সমস্ত নামায পড়িয়াছিলেন এবং একাধারে পনের বৎসর পর্যন্ত

তাহার শুইবার সুযোগ হয় নাই। একাধারে কয়েক দিন দিন এমনভাবে কাটিয়া যাইত যে, কোন কিছু মুখে দেওয়ারও সুযোগ হইত না।

যাহারা মোজাহাদা করিয়াছেন এমন লোকদের জীবনে এইরূপ বহু ঘটনা পাওয়া যায়। তাহাদের মত হওয়ার বাসনা খুবই কঠিন ব্যাপার—কেননা, আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে পয়দাই করিয়াছেন এইরূপ কাজের জন্য। কিন্তু যে সকল বুযুর্গানে-দীন, দীন ও দুনিয়া উভয়ের মধ্যেই মশগুল থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন তাহাদের মত হওয়ার বাসনাও আমাদের জন্য দুঃসাধ্য ব্যাপার।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) সম্পর্কে সকলেই অবগত আছে। খেলাফাতে রাশেদীনের পরেই তাঁহার মর্তবা। তাঁহার বিবি বলেন, ওযু-নামাযে মশগুল থাকে এমন বহু লোক পাওয়া যাইবে কিন্তু তাঁহার চাইতে বেশী আল্লাহকে ভয় করে এমন মানুষ আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। এশার নামাযের পর জায়নামাযে বসিয়া থাকিতেন এবং হাত উঠাইয়া দোয়া ও মোনাজাতে মশগুল হইতেন। আর কাঁদিতে কাঁদিতে এই অবস্থাতেই এক সময় তন্দ্রা আসিত আর চোখ লাগিয়া যাইত। আবার যখন চোখ খুলিয়া যাইত তখনই পুনরায় দোয়া ও কান্নায় মশগুল হইয়া যাইতেন।

বর্ণিত আছে যে, খেলাফত লাভের পর হইতে তাঁহার ফরজ গোসলের প্রয়োজন হয় নাই। তাঁহার স্ত্রী ছিলেন বাদশাহ আবদুল মালেকের কন্যা। পিতা কন্যাকে অনেক অলংকার ও ধনরত্ন দিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া এইগুলির সঙ্গে একটি অতুলনীয় হীরকও দিয়াছিলেন। খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) একদিন তাঁহার বিবিকে বলিলেন, দুইটি বিষয়ের মধ্যে যেকোন একটি তুমি গ্রহণ কর—তোমার এই সমুদয় অলংকার ও ধনরত্ন তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে দিয়া দাও; আমি উহা বায়তুল-মালে জমা করিয়া দিব। অন্যথায় তুমি আমার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ কর। কারণ, ধনরত্ন ও আমি এক ঘরে থাকিতে পারি না। বিবি আরজ করিলেন, এইসব ধনরত্ন একেবারেই নগণ্য; ইহা হইতে আরও অনেক বেশী হইলেও আমি এইসবের বিনিময়ে আপনাকে ত্যাগ করিতে পারি না। এই কথা বলিয়া তিনি সমস্ত ধনসম্পদ বায়তুল-মালে জমা করিয়া দিলেন।

খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আযীযের মৃত্যুর পর আবদুল মালেকের পুত্র ইয়াযীদ বাদশাহ হইলেন। তিনি বোনকে বলিলেন, তুমি চাহিলে তোমার সমস্ত অলংকার ফেরত দেওয়া হইবে। কিন্তু তিনি উত্তরে

বলিলেন, আমার স্বামীর জীবনকালে এইসব অলংকার রাখিতে আমি রাজী হই নাই এখন তাঁহার মৃত্যুর পর এইগুলি দ্বারা আমি কি করিয়া সমুপ্ত হইব।

মৃত্যুশয্যা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) লোকদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার এই রোগ সম্পর্কে কি ধারণা হয়? কেহ বলিল, লোকেরা ইহাকে যাদু মনে করিতেছে। তিনি বলিলেন, যাদু নয়। অতঃপর তিনি এক গোলামকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের লোভে তুমি আমাকে বিষপান করাইয়াছ? সে বলিল, আমাকে একশত স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হইয়াছে এবং আমার মুক্তির ওয়াদা করা হইয়াছে। তিনি বলিলেন, স্বর্ণমুদ্রাগুলি নিয়া আস। স্বর্ণমুদ্রাগুলি নিয়া আসিলে তিনি সেইগুলি বায়তুল-মালে জমা করিয়া দিলেন। অতঃপর গোলামকে বলিলেন, তুমি এমন কোথাও নিরুদ্দেশ হইয়া যাও যেখানে তোমাকে কেহ দেখিতে না পায়।

মৃত্যুর সময় হযরত মাসলামাহ (রহঃ) তাঁহার খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, আপনি সন্তানদের ব্যাপারে যে আচরণ করিয়াছেন তাহা সম্ভবতঃ আর কেহ করে নাই—আপনার তেরজন পুত্র সন্তান রহিয়াছে, তাহাদের জন্য কোন টাকা-পয়সা রাখিয়া গেলেন না। তিনি বলিলেন, আমাকে একটু বসাও। বসিয়া বলিলেন, আমি তাহাদের কোন হক নষ্ট করি নাই এবং অন্যের হকও আমি তাহাদিগকে দেই নাই। তাহারা যদি নেককার হইয়া থাকে, তবে আল্লাহ তায়ালাই তাহাদের জিস্মাদার, যেমন আল্লাহ পাক কুরআনে বলিয়াছেন : اَرْثَاهُ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ অর্থাৎ “একমাত্র আল্লাহই নেককার লোকদের রক্ষণাবেক্ষণকারী।”

(সূরা আর'াফ, আয়াত : ১৯৬)

আর যদি তাহারা গোনাহগার হয়, তবে তাহাদের ব্যাপারে আমার কোন পরওয়া নাই।

ফেকাহ-শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) সারাদিন মাসলা-মাসায়েলের চর্চায় মগ্ন থাকিতেন। ইহা সত্ত্বেও তিনি রাত্র-দিনে তিনশত রাকাত নফল নামায পড়িতেন। হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রহঃ) এক রাকাতে পুরা কুরআন শরীফ খতম করিতেন। হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (রহঃ) হাদীসের হাফেজ ছিলেন। এক রাত্রে তাহাজ্জুদ নামাযে তিনি অতিমাত্রায় ক্রন্দন করিয়াছিলেন। কেহ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, নামাযে তেলাওয়াতের সময় এই আয়াত শরীফ আসিয়া গিয়াছিল :

وَبَذَلَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (সূরা যুমার, আয়াত : ৪৭)

পূর্বের আয়াতে বলা হইয়াছে যে, জুলুমকারীদের কাছে যদি দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ থাকে, এমনকি সেই পরিমাণ আরও সম্পদও থাকে, তবে কিয়ামতের দিনের কঠিন আজাব হইতে বাঁচিবার জন্য তাহারা সমস্ত সম্পদ ফিদিয়া স্বরূপ দিয়া দিতে চাহিবে। অতঃপর উক্ত আয়াতে বলা হইয়াছে, আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহাদের সম্মুখে এমন ব্যাপার (অর্থাৎ আজাব) উপস্থিত হইবে, যাহা তাহাদের কল্পনাতেও ছিল না এবং তখন তাহাদের মন্দকাজসমূহ প্রকাশ হইয়া পড়িবে। হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (রহঃ) মৃত্যুর সময়ও খুব ঘাবড়াইতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, এই আয়াতকেই আমি ভয় করিতেছি।

হযরত ছাবেত বুনাঈ (রহঃ) হাদীসের হাফেজ ছিলেন। তিনি আল্লাহর সামনে এত অত্যধিক ক্রন্দন করিতেন যে, উহার কোন সীমা ছিল না। কেহ আরজ করিল, আপনার চক্ষু নষ্ট হইয়া যাইবে। তিনি উত্তর করিলেন, চোখের দ্বারা যদি ক্রন্দনই না করিলাম তবে ইহার উপকারিতাই বা কি? তিনি দোয়া করিতেন, হে আল্লাহ! কবরে যদি তুমি কাহাকেও নামায পড়িবার অনুমতি দাও, তবে তাহা আমাকেও দিও। আবু সিনান (রহঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, ছাবেত বুনাঈ (রহঃ)কে যাহারা দাফন করিয়াছে তন্মধ্যে আমি একজন ছিলাম। দাফনের সময় কবরের একটি ইট পড়িয়া গেল। দেখিতে পাইলাম তিনি দাঁড়াইয়া নামায পড়িতেছেন। আমি সঙ্গীকে বলিলাম, দেখ কি হইতেছে! সে আমাকে চুপ করিতে বলিল। দাফনের পর আমরা ছাবেত বুনাঈ (রহঃ)এর বাড়ীতে গিয়া তাহার কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, ছাবেত (রহঃ) কি আমল করিতেন? কন্যা জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা এই প্রশ্ন কেন করিতেছ? আমরা কবরের সেই ঘটনা শুনাইলাম। অতঃপর কন্যা বলিল, পঞ্চাশ বৎসর তিনি রাত্রি জাগরণ করিয়াছেন এবং সকালবেলায় এই দোয়া করিতেন, হে আল্লাহ! কাহাকেও যদি তুমি কবরে নামায পড়িবার অনুমতি দাও, তবে আমাকেও দান করিও। (একমাতুল হুজ্জাহ)

হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)এর জ্ঞানচর্চায় ব্যস্ততার কথা সকলেরই জানা আছে। ইহা ছাড়া সমগ্র ইসলামী খেলাফতের প্রধান বিচারপতি হিসাবেও তাঁহার ব্যস্ততা ছিল। এতদসত্ত্বেও তিনি দৈনিক দুইশত রাকাত নফল নামায পড়িতেন। হযরত মুহাম্মদ ইবনে নসর (রহঃ) একজন বিখ্যাত মুহাদ্দেস ছিলেন। তিনি এত বেশী একাগ্রতার সহিত নামায পড়িতেন যে, উহার দৃষ্টান্ত পাওয়া খুবই কঠিন। একবার নামাযের

ভিতর একটি ভীমরুল তাঁহার কপালে দংশন করার দরুন ক্ষতস্থান হইতে রক্তও বাহির হইল কিন্তু তিনি মোটেও নড়াচড়া করিলেন না এবং নামাযের মনোযোগের মধ্যেও সামান্যতম পার্থক্য দেখা দিল না। বর্ণিত আছে যে, নামাযের সময় তিনি কাঠের মত অনড় হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন।

হযরত বাকী ইবনে মুখাল্লাদ (রহঃ) দৈনিক তাহাজ্জুদ ও বেতরের তের রাকাত নামাযে কুরআন শরীফ খতম করিতেন। হযরত হান্নাদ (রহঃ) মুহাদ্দের ছিলেন। তাঁহার জনৈক শাগরেদ বর্ণনা করেন যে, তিনি খুব বেশী ক্রন্দন করিতেন। একদিন সকালবেলা তিনি আমাদিগকে ছবক পড়াইতে ছিলেন। ছবক হইতে উঠিয়া ওয়ূ ইত্যাদি হইতে ফারেগ হইয়া দুপুর পর্যন্ত নফল নামাযে মগ্ন থাকিলেন। অতঃপর বাড়ীতে গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই আসিয়া যোহরের নামায পড়াইলেন অতঃপর আছরের নামায পর্যন্ত নফল নামাযে মগ্ন থাকিলেন। তারপর আছরের নামায পড়াইলেন এবং মাগরিব পর্যন্ত কুরআন শরীফ তেলাওয়াতে মগ্ন থাকিলেন। মাগরিবের পর আমি চলিয়া আসিলাম। তাঁহার এক প্রতিবেশীকে আমি আশ্চর্য হইয়া বলিলাম, ইনি কত বেশী এবাদত করিয়া থাকেন। প্রতিবেশী বলিল, সত্তর বৎসর যাবত তিনি এইভাবেই এবাদত করিয়া আসিতেছেন, যদি তুমি তাহার রাত্রে এবাদত দেখিতে তাহা হইলে আরও আশ্চর্যবোধ করিতে।

হযরত মাসরুক (রহঃ) একজন মুহাদ্দের ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী বর্ণনা করেন, তিনি নামাযে এত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিতেন যে, সবসময় তাহার পা ফুলিয়া থাকিত। আমি পিছনে বসিয়া তাহার অবস্থার উপর দয়াপরবশ হইয়া কাঁদিতাম।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত এশা ও ফজরের নামায একই ওয়ূতে পড়িয়াছেন। হযরত আবুল মু'তামির (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তিনি এইরূপ করিয়াছেন। ইমাম গাযালী (রহঃ) আবু তালেব মক্কী (রহঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, চল্লিশজন তাবেঈ সম্পর্কে অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা এশা ও ফজর একই ওয়ূতে পড়িতেন। তাঁহাদের কেহ কেহ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত এই আমল করিয়াছেন। (ইত্বাক)

হযরত ইমাম আজম আবু হানীফা (রহঃ) সম্পর্কে অসংখ্য বর্ণনা আছে যে, ত্রিশ বৎসর কিংবা চল্লিশ বৎসর কিংবা পঞ্চাশ বৎসর এশা ও ফজর একই ওয়ূতে পড়িয়াছেন। বর্ণনার এই পার্থক্য বর্ণনাকারীদের জানার পার্থক্যের কারণে হইয়াছে। যিনি যত বৎসরের কথা জানিতে

পারিয়াছেন, তিনি তত বৎসর বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি শুধুমাত্র দুপুরে সামান্য সময় ঘুমািতেন এবং বলিতেন, হাদীস শরীফে দুপুরে ঘুমানোর হুকুম রহিয়াছে।

হযরত ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) রমযান মাসে নামাযে কুরআন শরীফ ষাট খতম করিতেন। এক বুয়ুর্গ বলেন, আমি কয়েকদিন ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর ঘরে ছিলাম—তাঁহাকে দেখিয়াছি শুধু রাত্রে সামান্য সময় ঘুমািতেন।

হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) দৈনিক তিনশত রাকাত পড়িতেন। তৎকালীন বাদশাহর হুকুমে বেত্রাঘাতের পর দুর্বলতা খুবই বাড়িয়া যাওয়ায় শেষ বয়সে দেড়শত রাকাত পড়িতেন। তখন বয়স প্রায় আশি বৎসর ছিল। আবু আন্তার সুলামী (রহঃ) চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত সারারাত্র ক্রন্দন করিয়া কাটাইতেন এবং দিনে সর্বদা রোযা রাখিতেন।

আল্লাহ পাকের তওফীকপ্রাপ্ত বান্দাদের সম্পর্কে এইরূপ হাজারো লাখে ঘটনা ইতিহাসের বিভিন্ন কিতাবে রহিয়াছে, লেখার গণ্ডিতে সেইগুলিকে আনা খুবই কঠিন। নমুনাস্বরূপ এই কয়েকটি ঘটনাই যথেষ্ট। আল্লাহ তায়ালা আপন দয়া ও মেহেরবাণীতে আমাকে এবং পাঠকগণকেও এই সমস্ত আল্লাহ ওয়ালাদের কিছুমাত্র অনুসরণ করার তওফীক দান করুন—আমীন।

① عَنْ عَمْرِو بْنِ يَاسِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْتَعِبُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلَّا عَشْرُ صَلَوَاتٍ تَنْتَعِبُهَا شَتَّى سَبْعًا سُدَّ سَهْلُهَا حُمْسُهَا رُبْعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کیلئے ثواب کا دسواں حصہ لکھا جاتا ہے اسی طرح بعض کیلئے نواں حصہ بعض کیلئے آٹھواں ساتواں چھٹا، پانچواں چوتھا، تہائی آدھا حصہ لکھا جاتا ہے۔

رواه البوداؤد وقال المنذرى فى الترغيب رواه البوداؤد والنسائى وابن حبان فى صحيحه بنحوه اه وعزاه فى الجامع الصغير الى احمد وابى داؤد وابن حبان ورفعه له بالصحيح وفى المنتخب عزاه الى احمد ايضا وفى الذر المنثور اخرج احمد عن ابى اليسر مرفوعا منك من يصلى الصلوة كاملة ومنكم من يصلى النصف والثلث والرابع حتى يبلغ العشر قال المنذرى فى الترغيب رواه النسائى باسناد حسن واسعه ابى اليسر كعب بن عمرو السلى شهد بذكر اه

নামায যখন বদ-দোয়া করে তখন নিজের ধ্বংসের অভিযোগ করিয়া লাভ কি? এই কারণেই আজ মুসলমান অধঃপতনের দিকে যাইতেছে, চারিদিকে শুধু ধ্বংসের আওয়াজই প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

অন্য এক হাদীসেও এই বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে এবং উহাতে অতিরিক্ত ইহাও রহিয়াছে যে, যে নামায খুশু-খুজুর সহিত পড়া হয়, উহার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলিয়া যায়। উহা অত্যন্ত নূরানী হয় এবং নামাযীর জন্য আল্লাহ তায়ালা দরবারে সুপারিশ করে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যে নামাযে কোমর বুকু হইয়া উত্তমরূপে রুকু আদায় করা হয় না, উহার উদাহরণ হইল ঐ গর্ভবতী স্ত্রীলোকের মত যাহার প্রসবের সময় নিকটবর্তী হইলে গর্ভপাত হইয়া যায়। (তারগীব) এক হাদীস শরীফে এরশাদ হইয়াছে, অনেক রোযাদার ব্যক্তি এমন রহিয়াছে, যাহাদের রোযা দ্বারা শুধু ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট ছাড়া আর কিছুই হাসিল হয় না। এমনভাবে অনেক রাত্রি জাগরণকারী শুধু জাগরণের কষ্ট ছাড়া আর কিছুই পায় না।

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন পাঁচ ওয়াক্তের নামাযসমূহ এরূপ লইয়া আসিবে, যাহাতে সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে, উত্তমরূপে ওযু করা হইয়াছে এবং খুশু-খুজুর সহিত পড়া হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য ওয়াদা করিয়াছেন যে, তাহাকে আজাব দেওয়া হইবে না। আর যে ব্যক্তি এইরূপ নামায লইয়া আসিবে না, তাহার জন্য আল্লাহ তায়ালা কোন ওয়াদা নাই—ইচ্ছা করিলে তিনি নিজ রহমত গুণে মাফ করিয়া দিবেন অথবা আজাব দিবেন।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের নিকট তশরীফ আনিলেন এবং বলিলেন, তোমরা কি জান আল্লাহ পাক কি বলিয়াছেন? সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) উত্তর করিলেন, আল্লাহ ও তাহার রাসূলই ভাল জানেন। অধিক গুরুত্ব বুঝাইবার জন্য তিনি একই প্রশ্ন তিনবার করিলেন এবং সাহাবীগণ একই উত্তর দিলেন। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, আল্লাহ তায়ালা আপন ইজ্জত ও বড়ত্বের কসম করিয়া বলিতেছেন, যে ব্যক্তি সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই সকল নামায পড়িতে থাকিবে, আমি তাহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাইব। আর যে ব্যক্তি ইহা করিবে না ইচ্ছা করিলে তাহাকে নিজ রহমতে ক্ষমা করিব, না হয় আজাব দিব।

عَنْ أَبِي مَرْثُودَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ خَابَ وَخَسِرَ إِنَّ إِنْشَقَّ مِنْ فَرِيضَةٍ قَالَ الرَّبُّ أَنْظِرُوا هَذَا عَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيَكْمَلُ بِهَا مَا انْقَضَ مِنْ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ.

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائیگا اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب ہوگا اور بامراد، اور اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد، خسارہ میں ہوگا اور اگر کچھ نماز میں کمی پائی گئی تو ارشاد خداوندی ہوگا کہ دیکھو اس بندہ کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے۔ اگر نکل آئیں تو ان سے فرضوں کی تکمیل کر دی جائیگی اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال روزہ و زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا۔

رواه الترمذی وحسنه النسائی وابن ماجه والحاکم وصححه كذا في الدرر وفي المنتخب برواية الحاکم في المتن عن ابن عمر اول ما افترض الله على امتي الصلوات الخمس واول ما يرفع من اعمالهم الصلوات الخمس الحديث بطوله بمعني حديث الباب وفيه ذكر الصيام والزكوة نحو الصلوة وفي الدرر اخر ابو يعلى عن انس رفعه اول ما افترض الله على الناس من دينهم الصلوة واخر ما يبقى الصلوة واول ما يحاسب به الصلوة يقول الله انظروا في صلوة عبدی فان كانت تامة كتبت تامة وان كانت ناقصة قال انظروا هل له من تطوع الحديث فيه ذكر الزكوة والصدقة وفيه ايضا اخرج ابن ماجه والحاکم عن تميم الدارمی مرفوعاً اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلواته الحديث وفي اخره ثم الزكوة مثل ذلك ثم تؤخذ الاعمال حسب ذلك وعنده الطبرانی في الجامع الى احمد والبی داؤد والحاکم وابن ماجه ورفعه بالصحيح

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, কিয়ামতের দিন বান্দার আমলসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম ফরজ নামাযের হিসাব লওয়া হইবে। যদি তাহার নামায ঠিক হয়, তবে সে কামিয়াব ও

সফলকাম হইবে। আর যদি তাহার নামায ঠিক না হয়, তবে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। যদি তাহার ফরজ নামাযে কিছু ঘাটতি দেখা যায়, তবে আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, দেখ, এই বান্দার কিছু নফল আছে কিনা, যাহা দ্বারা তাহার ফরজের ঘাটতি পূরণ করা যাইতে পারে। যদি পাওয়া যায়, তবে উহা দ্বারা তাহার ফরজ পূরণ করিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর বান্দার রোযা, যাকাত ইত্যাদি অন্যান্য আমলের হিসাব লওয়া হইবে।

(দুরের মানসূর : তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)

ফায়দা : উক্ত হাদীস শরীফের দ্বারা জানা গেল যে, প্রত্যেকের নিকট যথেষ্ট পরিমাণ নফলের পুঁজিও রাখা উচিত। যাহাতে ফরজের মধ্যে কোন ঘাটতি হইলে নফলের দ্বারা সেই ঘাটতি পূরণ করিয়া লওয়া যায়। অনেকেই বলিয়া থাকে, আরে ভাই আমাদের দ্বারা শুধু ফরজ পুরা হইয়া গেলেই যথেষ্ট ; নফল পড়া তো বুয়ুগদের কাজ। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, ফরজই যদি পুরাপুরি আদায় হইয়া যায় তবে তো যথেষ্ট হইবে কিন্তু উহা পুরাপুরি আদায় হওয়া কি সহজ কাজ। যখন কম-বেশী ভুল-ত্রুটি হইয়াই থাকে তখন উহা পুরা করিবার জন্য নফল ছাড়া উপায় নাই।

অন্য এক হাদীসে আরও বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে, আল্লাহ তায়ালা এবাদতের মধ্যে সর্বপ্রথম নামায ফরজ করিয়াছেন, সর্বপ্রথম সমস্ত আমলের মধ্যে নামাযকেই পেশ করা হয় এবং কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এই নামাযেরই হিসাব লওয়া হইবে। যদি ফরজ নামাযে কিছুটা কমি দেখা যায়, তবে নফল দ্বারা উহা পূরণ করা হইবে। অতঃপর একইভাবে রোযার হিসাব লওয়া হইবে—ফরজ রোযার মধ্যে যেসব কমি পাওয়া যাইবে নফল রোযার দ্বারা উহা পূরণ করা হইবে। অতঃপর যাকাতের হিসাবও একইভাবে লওয়া হইবে। এই সমস্ত আমলের সহিত নফল যোগ করিবার পর যদি নেকীর পাল্লা ভারী হয়, তবে সে আনন্দচিন্তে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। অন্যথায় তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই আদত ছিল যে, কেহ নতুন মুসলমান হইলে সর্বপ্রথম তাকে নামায শিক্ষা দিতেন।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْظٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَلَّاهُ
نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا ارشاد ہے کہ قیامت
میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا
اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی
پورے اتریں گے، اور اگر وہ خراب ہوگئی تو

صَلَّحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَلَا تَنْكَرُتُ
بِاقِي أَعْمَالِهِ خَرَابَ نَعْلَيْكَ

فَكَذَّبَ سَائِرُ عَمَلِهِ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک اعلان سب جگہ کے حکام کے پاس بھیجا تھا کہ سب سے زیادہ ہمتم بالشان چیز میرے نزدیک نماز ہے جو شخص اس کی حفاظت اور اس کا اہتمام کرے گا وہ دین کے اور اجزاء کا بھی اہتمام کر سکتا ہے اور جو اس کو ضائع کر دے گا وہ دین کے اور اجزاء کو زیادہ برباد کرے گا۔

(رواه الطبرانی فی الأوسط ولا بأس باسناده انشاء الله كذا في الترغيب وفي المنتخب برواية الطبرانی فی الأوسط والبعض عن انس بلقظه وفي الترغيب عن ابی هريرة رفعه الصلوة ثلثة اثلثة الطهور ثلث والركوع ثلث والسجود ثلث فمن اداها بحقها قبلت منه وقبل منه سائر عمله ومن ردت عليه صلواته رده عليه سائر عمله رواه البزار وقال لا نعلمه مرفوعا الا من حديث المغيرة بن مسلم قال الحافظ واسناده حسن اه واخرج مالك في الموطا ان عن ابن الخطاب كتب الى عماله ان اهم اموركم عندي الصلوة من حفظها او حافظ عليها حفظ دينه ومن فيها فهو لسا سراها اضع كذا في الدرر)

৪) হযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব লওয়া হইবে। যদি উহা উত্তম ও পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যায়, তবে অন্যান্য আমলও সঠিক বলিয়া গণ্য হইবে। আর যদি উহা খারাপ হয়, তবে অন্যান্য আমলও খারাপ বলিয়া গণ্য হইবে। (তারগীব : তাবারানী)

হযরত ওমর (রাযিঃ) তাঁহার খেলাফতের যুগে সব এলাকার শাসনকর্তাদের নামে একটি ফরমান পাঠাইয়াছিলেন যে, আমার নিকট সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল নামায। যে ব্যক্তি উহার হেফাজত এবং এহতেমাম করিবে, সে দ্বীনের অন্যান্য কাজেরও এহতেমাম করিতে পারিবে। আর যে ব্যক্তি নামাযকে ধ্বংস করিবে সে দ্বীনের অন্যান্য কাজকে আরও বেশী ধ্বংস করিবে। (দুরের মানসূর : মুআত্তা মালেক)

ফায়দা : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই পবিত্র বাণী এবং হযরত ওমর (রাযিঃ) এর ঘোষণার উদ্দেশ্য বাহ্যতঃ ইহাই, যাহা অন্য হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, শয়তান মুসলমানকে ততক্ষণ পর্যন্ত ভয় করে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে পাবন্দীর সহিত উত্তমরূপে নামায আদায় করিতে